আফগানিস্থান ভ্রমণ

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

অশোক পুস্তকালয়
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
৬৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—১

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আফগানিস্থান ভ্রমণ করার সময় যাহা দেখেছি এবং শুনেছি তাই লিখেছি। ১৯১৯ সালের মে মাসে আফগানিস্থান স্বাধীন হয় এবং ইহা একটি বাফার স্টেটে পরিণত হয়। যদিও আফগানিস্থান স্বাধীনতালাভ করেছিল কিন্তু নানা কারণে সাধারণ লোকের কোন উন্নতি হয় নি। রক্ষণশীলতা ও সনাতন আচার-পদ্ধতির বেড়াজাল ছাড়িয়ে যেতে যে পরিমাণ শিক্ষা এবং আন্দোলনের আবশ্যক, আফগানিস্থানে তার অভাব দেখেছি। রাজা আমানউল্লা নূতন জগতের নূতন ধারায় দেশটাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে অবসর তিনি পান নি। যে পরিবর্তন ও উন্নতি আফগানিস্থানে এখনও আসে নি এক দিন সেই পরিবর্তন নিশ্চয় আসবে, আফগানিস্থানের জনগণ চারিদিকের দৃষ্টান্ত দেখে উদ্বুদ্ধ হবে।

আফগানিস্থানের বাসিন্দা সম্বন্ধে আমাদের মনে অনেক উদ্ভট ধারণা রয়েছে। আমাদের ধারণা আফগানিস্থান যেমন কর্কশ এবং পর্বতসংকুল তেমনি আফগান্‌রাও বুঝি দয়ামায়াহীন, অর্থলোভী এবং হিংস্র। বস্তুত তা' নয়। আফগানিস্থান সম্বন্ধে এই প্রকার বিকৃত ধারণা পোষণ করার কোনও হেতু আমি পাই নি।

আমার ভ্রমণ কাহিনী পড়ে আফগানিস্থানের যথার্থ স্বরূপ বুঝবার যদি সহায়তা হয় তবেই আমি কৃতার্থ মনে করব এবং আমার আফগানিস্থান ভ্রমণও সফল হবে।

অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ
১৫৬, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা-৬

গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকাই আফগানিস্থান ভ্রমণের শেষ ভূমিকা—ভবিষ্যতে এই পুস্তকের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন আর কিছুই হবে না।

আফগানিস্থানের ভবিষ্যৎ দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। এই দেশের তিন দিকে যে সকল দেশ আছে এক রুশিয়া ছাড়া প্রত্যেকটি দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই পরিবর্তনের সময় আফগানিস্থানও আপনা হতেই রূপ বদলাতে বাধ্য হবে। আফগানিস্থানের লোকসংখ্যা খুবই কম এবং দেশটা পর্বতমালায় সমাকীর্ণ। নূতন পরিবর্তনের সময় এ দেশের লোকক্ষয় কমই হবে—সেজন্য আফগান জাত কারো কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলেও চলবে। যদি তাদের কারো কাছে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে হয় তবে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তাদের দেশের পর্বতমালার কাছে। পর্বতমালা হবে তাদের আশ্রয়।

গ্রন্থকার

কাবুলের পথে

আমাদের দেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত আফগানিস্থান। আফগানিস্থানের বাসিন্দাকে আমরা কাবুলি বলি এবং কাবুলিদের আমাদের দেশে মহাজনী কারবার করতেই দেখতে পাই। এরা আমাদের দেশে আসা-যাওয়া করে। আমরা কিন্তু ওদের দেশে অতি অল্পই গিয়ে থাকি। আমার ধারণা ছিল, ভারতের যে সকল লোক মুসলমান ধর্ম মেনে চলেন তাঁরা তাঁদের স্বধর্মাবলম্বীদের অধ্যুষিত দেশগুলিতে আসা-যাওয়া করেন; কিন্তু আফগানিস্থান, ইরান, আরব, সিরিয়া, লাবানন এবং তুর্কি ভ্রমণ করে দেখলাম, আমার এ ধারণা ঠিক নয়। আমাদের দেশের লোক ওদের দেশে কমই যায়। না যাবার কারণ হ'ল, পাসপোর্ট যোগাড় করতে খুব বেগ পেতে হয়। দ্বিতীয় কারণ হ'ল, আফগানিস্থান সম্বন্ধে অনেকগুলি ভীতিপ্রদ গল্প আমরা ছোটবেলা হতে শুনে এসেছি। আমরা সেই গল্পগুলিকে সত্য বলেই মনে করি, সেজন্যও অনেকে আফগানিস্থানে যেতে চান না। লাহোর, রাওলপিণ্ডি এবং পেশোয়ারে সেরূপ গল্প আমাকেও শুনানো হয়েছিল, কিন্তু আমি তাতে কান দিইনি। তারপর যখন আফগানিস্থানে গেলাম, তখন দেখলাম কাবুলিরাও আমাদের মতই মানুষ, এবং তাদের দেশটাও আমাদের দেশের মতই 'মাটির'।

চীন, জাপান, কোরিয়া, থাইলেণ্ড, ইন্দোচীন এবং মালয় দেশ ভ্রমণ করে যখন কলিকাতায় এলাম, তখন সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের জানিয়েছিলাম যে আফগানিস্থান হয়ে ইউরোপ যাবার ইচ্ছা আমার আছে। ভাবিনি এতে আমার কোন ক্ষতি হবে। কথাটা প্রচার হওয়া মাত্রই জনকতক অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তি আমার পাসপোর্ট দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিনা

দ্বিধায় তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করেছিলাম। পাসপোর্ট নিয়েছিলাম সিংগাপুর থেকে। ভুলবশত তাতে আফগানিস্থান শব্দটি লেখাইনি। যারা হিতৈষী সেজে আমার পাসপোর্ট দেখেছিলেন, তারা পাসপোর্টের এই ত্রুটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণই নীরব ছিলেন। এমন কি দিল্লীর আফগান-কনসালও এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে আফগানিস্থান যাবার 'ভিসা' দিয়েছিলেন।

কলিকাতা হতে পেশোয়ারের পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি, শুধু গুজরাত শহরে একদিন সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান হ'লে বুঝেছিলাম শরীরের দুর্বলতাই এই পতনের একমাত্র কারণ। রোড-পুলিশ দয়া করে আমাকে উঠিয়ে পাশেই আর্যসমাজীদের পরিচালিত একটি মেয়েদের স্কুলে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, মাতৃজাতির একজনও এই হতভাগ্যের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হন নি। এমন দুর্ঘটনা যদি ইউরোপের কোথাও ঘটত, তবে মায়ের জাতই সর্বপ্রথম আমার সাহায্যার্থ এগিয়ে আসতেন।

গুজরাতের ঘোল খেয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই চাংগা হয়ে উঠলাম। এবার পেশোয়ারের দিকে রওনা হলাম এবং নির্বিঘ্নেই পেশোয়ার শহরে পা দেবার পরই কতকগুলি অতিরিক্ত-কৌতূহলী লোক আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে নানারূপ প্রশ্ন করতে থাকে। ওদের হাত হতে নিজকে বাঁচিয়ে নিকটস্থ একটা ধর্মশালায় উঠলাম। ধর্মশালার একটি রুম দখল করে একখানা চারপাই-এর উপর শ্রান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে ভাবছিলাম "এ আবার কি?"

বিকেলে ধর্মশালা হতে বেরুতে যাব এমন সময় দাশগুপ্ত নামে এক যুবকের সংগে দেখা হ'ল। পায়ে হেঁটে সে ভারত-ভ্রমণ করছিল। আলাপ-পরিচয় হবার পর আমাকে নিয়ে সে স্থানীয় কালীবাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। কালীবাড়ী ধর্মস্থান বলে শুধু ধার্মিকেরাই যে সেখানে যাওয়া-আসা করে থাকেন, ধূর্ত পুলিশ কখনই তা মনে করে না। চোর ডাকাত ভিন্নও

লিভারপুল
প্যারী
প্রাগ
বুদাপেস্ত
বেলগ্রেড
সোফিয়া
আঙ্কারা
আদানা
বেরুদ
পোর্ট সৈয়দ
মাসাদ
হিরাত
দিল্লী
বোম্বে
কলিকাতা
সিংগাপুর
মানচিত্রে ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের দ্বিতীয় বারের ভ্রমণপথ দেখান হয়েছে। ১৯৩৩ খৃঃঅঃ জানুয়ারী মাসের প্রথমভাগে তিনি সিংগাপুর হতে রওয়ানা হয়ে, ইউরোপ ভ্রমণ সমাপ্ত করেই কলিকাতায় ফিরে আসতে বাধ্য হন।
ভ্রমণপথ
হরেন চক্রবর্তী
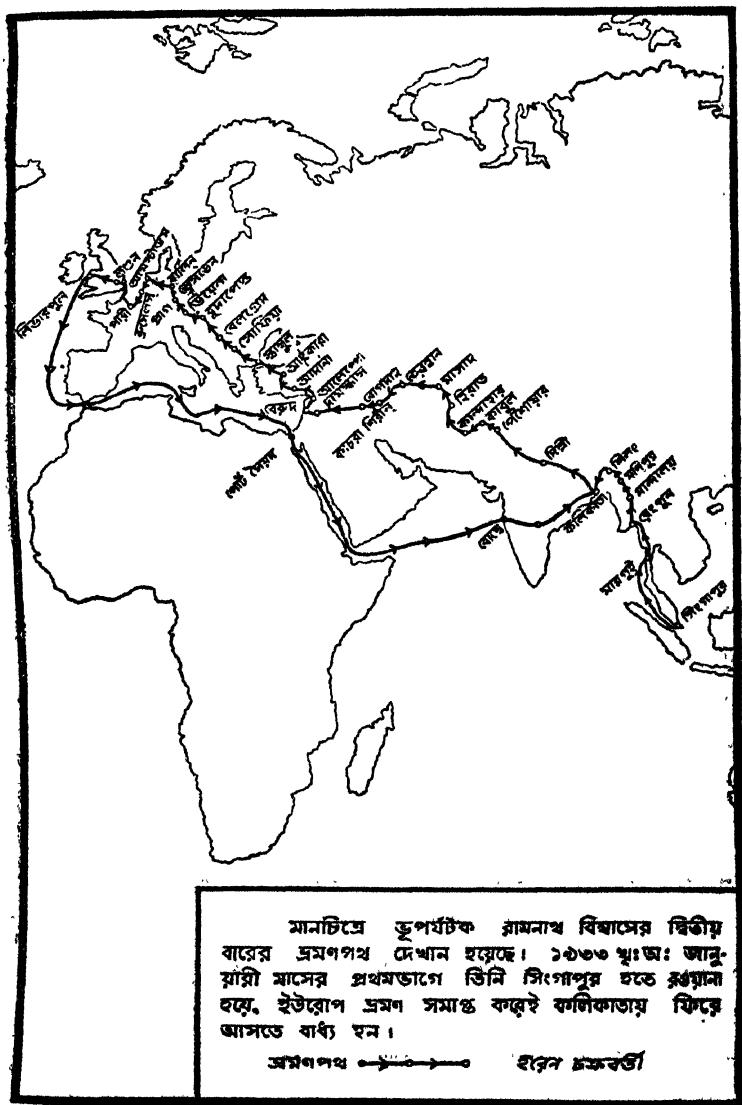
বিদেশী সরকারের চক্ষে আর এক শ্রেণীর লোক যারা দেশভক্ত বলে বিশেষভাবে পরিচিত, তারাও যে কালীমাতার শরণাগত হন পুলিশ তা জানত; সেজন্য দেবালয়ে আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হতাম, তা ছাড়া আমার মত দেবভক্তিহীনের পক্ষে দেবতার মন্দিরে আশ্রয় লওয়াটা অসঙ্গত বলেই মনে করতাম। কালীবাড়ীতে পৌছামাত্রই পূজারী ঠাকুর ভিজে-বেড়ালটির মত কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কবে আফগানিস্থানে যাবেন?" ভাবখানা যেন তিনি আমাকে বেশ ভাল করেই চেনেন।

লোকটার কথার কোন জবাব দিতেও আমার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। তবুও ভদ্রতার খাতিরে বললাম, রওনা হ'লেই হ'ল আর কি। কাছে উপবিষ্ট একটা মোটা লোক বললে, অনেকেই বলে বটে আফগানিস্থানে যাবে, কিন্তু আসলে কেউ যায় না, যাবার ক্ষমতাও রাখে না।

এদের কোন কথার জবাব না দিয়ে দাশগুপ্তকে নিয়ে বরাবর সিনেমা ঘরের দিকে চলে গেলাম। এ-সব প্রশ্ন বড় দুর্লক্ষণ বলে মনে হ'ল। মনে বড়ই ভয় হচ্ছিল, বোধ হয় আমার অগ্রগতির পথে কোন বাধাবিঘ্ন হতে পারে। চিন্তা করে ঠিক করলাম পরদিন সকালেই স্থানীয় আফগান-কন্সালের সংগে সাক্ষাৎ করব এবং তাঁর কাছ হতেই জানতে পারব আমার পাসপোর্টে কোন ত্রুটি আছে কিনা?

পরদিন সকালেই আফগান-কন্সালের বাড়ী গেলাম। পাসপোর্ট দেখেই কন্সাল অফিসের একজন যুবক-কেরানী বললেন, আপনি আফগানিস্থানের দিকে রওনা হয়ে ভালই করেছেন। কি করে যে দিল্লীর কন্সাল-জেনারেল আপনার পাসপোর্টে ভিসা দিয়ে দিলেন, তা মোটেই বুঝতে পারছি না। যা হোক, এখন আপনি এখানকার সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে পাসপোর্টে "আফগানিস্থান" শব্দটি লিখিয়ে নিয়ে আসুন, তবেই সকল হাংগামা হতে রক্ষা পাবেন।

যুবকের কথামত সেক্রেটারিয়েটে গেলাম এবং একজন হিন্দু কেরানীর সংগে সাক্ষাৎ করলাম। কেরানী বেশ আরাম করে বসে ছিলেন। আমাকে দেখামাত্রই তাঁর যেন মেজাজ বদলে গেল। মেয়েলি স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাই আপনার? আপনার জন্য আমি কি করতে পারি? বলুন, বলুন, আমার যে মরবারও ফুরসৎ নেই।" তার মুরুব্বিয়ানায় আমি একটু হেসে বললাম, এই আমার পাসপোর্ট, এতে আফগানিস্থান শব্দটি লিখিয়ে নিতে চাই।

আমার কথা শোনামাত্রই কেরানী চোখ দুটো কপালে তুলে বললেন, "এটা কি করে হয়? এ কখনও হতে পারে না।"

আমি বললাম, একটু বসতে চাই, আপত্তি নেই তো?

কেরানী সামনের চেয়ারটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি বসলাম এবং চশমা খুলে নিজের হাতের রেখাগুলোর দিকে নিবিষ্টমনে তাকিয়ে রইলাম, যেন আমি হস্তরেখা-বিদ্যায় খুব ওস্তাদ। কেরানীও বেশীক্ষণ আর স্থির থাকতে পারলেন না, আমাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার হাতে কি দেখলেন? আমি মাথা ঝাঁকিয়ে গাম্ভীর্যের ভান করে বললাম, "দেখতে পাচ্ছি তিন দিনের মধ্যে আমি আফগানিস্থান পৌঁছব, তাতে আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।" আমার কথা শুনে কেরানীও তাঁর ডানহাতটা বাড়িয়ে দিয়ে নিজের ভাগ্যের কথা আমার কাছ থেকে জানতে চাইলেন। তাঁর হাত দেখে অনুমানের উপর নির্ভর করে যা বলেছিলাম, তাতেই তিনি খুশী হয়েছিলেন।

আবার আমি তাঁর কাছে আমার কাজের কথা পাড়লাম। এবার কেরানী অনেকটা সদয়চিত্ত হয়েছেন এবং পরদিন সকালে দেখা করতে বললেন।

হিন্দু কেরানীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফেরবার পথে দেখা হ'ল একটি মুসলমান কেরানীর সংগে। তিনি ডেকে নিয়ে আমাকে তাঁর রুমে বসালেন এবং বললেন, যে কাজের জন্যে আমি এতক্ষণ কথা বলছিলাম, সে কাজটি তাঁরই কাজ,

অন্য কারও নয়। এই বলেই তিনি বললেন, দিন তো পাসপোর্ট, এখনই কাজটা সেরে দিচ্ছি। যুবক আমার হাত থেকে পাসপোর্ট নিয়ে তাতে আফগানিস্থান শব্দ লিখে দিলেন। তারপর বললেন, পরদিন সকালে আমি যেন প্রাইভেট সেক্রেটারির সংগে দেখা করি। বুঝলাম তিনি বেশ ভাল লোক, তাঁর দ্বারা আমার কিছু উপকারও হতে পারে।

পরদিন সকালে যুবকের কথামত প্রাইভেট সেক্রেটারির সংগে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে পর্যটকরূপেই গ্রহণ করলেন, শাসক-শাসিতের সম্পর্ক ভুলে গিয়ে অন্তরংগভাবে আলাপ করলেন। ইংরেজ যুবক আমাকে তাঁদের দেশে যেতে উৎসাহিত করলেন এবং বিশেষভাবে বলে দিলেন, ব্রিটেনে গিয়ে যেন শিলিং হোস্টেল চেন-এর মেম্বর হই, সেই হোস্টেলগুলিতে থেকেই ব্রিটেনের জনগণের সত্যিকার চেহারা দেখতে পাব।

দারিদ্র্য জিনিসটার রূপ পৃথিবীর সর্বত্রই এক হ'লেও দারিদ্র্যের কারণ সর্বত্র এক নয়। ব্রিটেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে সর্বদাই লড়াই করে, প্রকৃতিকে আয়ত্তে এনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুঠ করবার চেষ্টা করছে। সে-লুঠের মোটা ভাগ পাচ্ছে যারা শক্তিমান, যারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এবং লুণ্ঠনে যাদের প্রকৃত যোগ সবচেয়ে কম। আর যারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার জয় করে আনে, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভাগেই বখরা পড়ে সবচেয়ে কম। যান্ত্রিক সভ্যতায় যে-সব দেশ বিশেষ পুষ্টিলাভ করেছে, সে-সব দেশে দারিদ্র্য টাকাকড়ি কম বলেই নয়, বণ্টনের দোষে। আর আমাদের দেশের দারিদ্র্য যান্ত্রিক সভ্যতা বা বৈদেশিক শোষণের জন্যে ততটা নয়, যতটা আমাদের স্বভাবের দোষে। আমাদের দার্শনিকগণ দারিদ্র্যকে উচ্চ আসন দিয়েছেন। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থেকে উচ্চ চিন্তা করার শিক্ষা আমরা পেয়ে এসেছি। তাই আমাদের দেশে প্রকৃতি তাঁর সব সম্পদ্ উন্মুক্ত করে ধরে রাখা সত্বেও আমাদের দেশের লোক ক্ষুধায় কাতর, দেনায় জর্জরিত, স্বাস্থ্যে বঞ্চিত এবং পরানুগ্রহে লাঞ্ছিত। কষ্ট করে এদেশের লোক কিছু অর্জন কবতে

পরাঙ্মুখ, ভিক্ষাস্বরূপ অল্পস্বল্প পেলেই সন্তুষ্ট। এতে জীবন্মৃত হয়ে টিকে থাকা চলে, কিন্তু উচ্চ চিন্তা কখনই সম্ভব নয়। প্রভূত বাহ্যিক সম্পদ্ না হ'লে সভ্যতার উন্নতি কখনই হবে না, দরিদ্র জাতি মনুষ্যত্ব হারিয়ে ধ্বংসকে ডেকে আনবে। আমরা ভারতবাসীরাও তাই করছি।

ইংরেজ যুবকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন উঠলাম, তখন তিনি সবিনয়ে আমার হাতে দশটি টাকা দিয়ে বললেন, পর্যটকের পাথেয়ের জন্যে এ তাঁর যৎসামান্য সাহায্য, আমি গ্রহণ করলেই তিনি কৃতার্থ হবেন।

এই ইংরেজ যুবকের ভদ্র ব্যবহারে সেদিন আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। প্রভুত্বের মোহে ইংরেজ তনয়গণ এদেশে অন্ধ, তাদেরই একজন এত বড় উচ্চপদের অধিকারী হয়েও আমার মত ধনমানহীন পরাধীন দেশের অধিবাসীর প্রতি যে আচরণ করলেন, তা অপ্রত্যাশিত।

যা হোক, এবার আমি ভারতের সীমান্তের দিকে পা বাড়ালাম।

সীমান্তে একটা কাস্টম হাউস আছে। কাস্টম অফিসার একজন ভারতীয়। তিনি পাঠানদের পাসপোর্টগুলি একরূপ না দেখেই সীলমোহর করলেন। তাঁর কার্যকলাপ দেখে আমি তখন ভাবছিলাম, একটা গোলাম অন্য একটা গোলামকে স্বাধীন দেশে যেতে দেখতেও রাজী নয়; এজন্যই এরূপ বাড়াবাড়িভাবে আমার পাসপোর্ট পরীক্ষা করছে। অফিসার যখন পাসপোর্ট পরীক্ষা করে সীলমোহর করলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, মনে অনেক আঘাত লেগেছে নিশ্চয়ই আমাকে আটকে রাখতে পারেন নি বলে? দাসসুলভ মনোবৃত্তির এটাই বৈশিষ্ট্য। আপনি অথবা আমি যদি স্বাধীন জাতের লোক হতাম, তবে আমারই পাসপোর্টে সীলমোহর পড়ত সর্বাগ্রে। অফিসার নীরবে অন্য কাজে মন দিলেন।

সীমান্ত পার হয়ে পার্বত্য উপত্যকার উপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলাম। উত্তরের হাওয়া এসে আমার নাকে মুখে ক্রমাগত ঝাপটা

মারছিল। আমার মন আরও উত্তরে যাবার জন্য উন্মুখ ছিল। কিন্তু যেতে হবে দক্ষিণ-পশ্চিমের পথ ধরে। আরও দু'মাইল যাবার পর এলাম আফগান কাস্টম্ হাউসে। সেখানে পাসপোর্ট শুধু সীলমোহর লাগিয়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রশস্ত পথটা ছেড়ে দিয়ে উত্তরের পথে অগ্রসর হলাম। আমার সামনে নগ্ন উন্নত তরঙ্গায়িত পর্বতমালা ক্রমে উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে আরও উত্তরে গিয়ে কালো মেঘের গায়ে মিশেছিল। সে-দৃশ্য একাকী দাঁড়িয়ে উপভোগ করতেছিলাম। সে-দৃশ্য আরও দেখবার জন্যে মন চাইছিল, দক্ষিণ দিকে যেতে মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। উত্তরের ঢেউ-খেলানো পর্বতমালা যেন আমায় দু'হাত বাড়িয়ে ডাকছিল কিন্তু আমার গন্তব্যপথ আমায় টানছিল দক্ষিণ-পশ্চিমের পথে।

একটা পাথরের উপর বসে ভাবতেছিলাম, এই তো সেই আফগানিস্থান, আফগান জাতের বাসভূমি, যাদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের লোক কত ভ্রান্ত কাহিনী শুনে ভয়ে থর-থর করে কাঁপে। কিন্তু আমাকে তো এখনও কোন পাঠান আক্রমণ করছে না, আমি একাকী, আমার হাতে কোন অস্ত্র নেই। তারপর হঠাৎ চিন্তাধারা বদলে গেল। মনে হ'ল এটাতো বিদেশ নয়, এদেশ আমাদেরই। ঐ তো উত্তর দিক হতে হিমালয়ের শাখা হাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকছে। ঐ তো কংকরময় সমতলভূমি, দুম্বা-রক্ষকগণ লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গোলগাল মুখ দেখলেই মনে হয় ককেশাস রক্ত তাদের শরীরে বইছে। যদিও তাদের গায়ের পোস্তিন হতে একটা বিশ্রী গন্ধ বের হয়ে আসছে, তবুও তারা স্বাধীন। স্বাধীনতার গন্ধ এক-একবার মনকে কোন্ সুদূর ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু যখনই মনে হতেছিল আমি বস্তুতপক্ষে পরাধীন দেশের লোক, তখনই কে যেন সজোরে আমাকে আছড়ে ফেলে দিতেছিল কঠিন মাটির ওপর। স্বাধীন দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজের দেশের পরাধীনতার গ্লানিকে বেশ ভাল করে হৃদয়ংগম করতেছিলাম।

সামনে চেয়ে দেখলাম একটা অন্ধকার আবরণ যেন ভারতমাতার মহিমা-মণ্ডিত মূর্তিকে ঢেকে রেখেছে, আর আমার হাত সেদিকে আপনি চলে যাচ্ছে অবাঞ্ছিত অন্ধকার-আচ্ছাদনটাকে সরিয়ে ফেলতে। স্বাধীন দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল আমার কোনও অধিকার নেই স্বাধীন দেশে থাকতে। আমার গায়ের বাতাসও স্বাধীন দেশের বাতাসকে কলুষিত করে তুলবে। তাই মনের ভেতর থেকে আর্তস্বরে একই কথা বার বার বেরিয়ে আসছিল—স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!

কতক্ষণ পথ চলার পরই একটি ছোট গ্রাম পেলাম। গ্রামে গোলাবাড়ী নেই। গ্রামের একমাত্র দোকান অর্দ্ধেকটা খোলা। যে অংশে বেনের দোকানের জিনিস বিক্রী হয় সে অংশটাই শুধু খোলা, অন্য অংশটা বন্ধ। উঁকি মেরে দেখলাম অন্য অংশটাতে গোস্ত-রুটি রয়েছে। ক্ষিদে বেশ ছিল, তাই দোকানদারকে বললাম গোস্ত-রুটি দেবার জন্যে। দোকানদার বললে, রোজার মাসে সে খাদ্য বিক্রী করবে না। আমি বললাম, তুমি না হয় উপোস করে স্বর্গে যাবে, আমি স্বর্গে যেতে চাইনে, বেঁচে থাকতে চাই। তারপর আমি মুসলমান ধর্মের লোকও নই, আমার কাছে খাদ্য বিক্রী করতে কি আপত্তি থাকতে পারে? উপরন্তু আমি ক্ষুধায় কাতর। দোকানদার বললে, যদি নিজের হাতে খাবার নিয়ে খাই তবে বিক্রী করতে তার কোন আপত্তি নেই। আমি তাতে রাজী হলাম।

একটা ডালাতে কতকগুলো পাঠান-রুটি এক টুকরা ময়লা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। রুটিগুলি চাপাতি হতে চারগুণ বড় এবং ঢের পাতলা। রুটি হতে বেশ মিষ্টি গন্ধ বের হয়ে আসছিল। ছু'খানি রুটি বের করে নিয়ে ডালাটিকে পূর্বের মত ঢেকে রেখে নিকটস্থ একটা হাঁড়িতে হাত দেওয়ামাত্র দোকানী চীৎকার করে উঠল। বললে, এটাতে যে-মাংস আছে তা তুমি খেতে পার না, দাঁড়াও আমি গরম জল নিয়ে আসছি। বুঝলাম তাতে গোমাংস ছিল। গরম জল

এনে দেবার পর অন্য হাঁড়ি হতে দু' টুকরা মুরগীর মাংস বের করে নিলাম। এ-সব হোটেলে মুরগীটাকে মাত্র চার টুকরা করেই পাক করা হয়। দু' টুকরা মুরগীর মাংস এবং দু'খানা পাঠান-রুটি অবলীলাক্রমে উদরস্থ করলাম।

ভোজনের তৃপ্তি মুখেই ফুটে ওঠে। আমার মুখাবয়বে সেই তৃপ্তির ভাব ফুটে ওঠায় পাঠানও খুশী হয়েছিল। ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বেড়িয়ে অনুভব করেছি, ভোজন করিয়ে তৃপ্ত হতে অনেকেই চায়। বর্তমানে অভাবের তাড়নায় এই ভাবটি লোপ পেতে বসেছে। পাঠান যদিও পয়সা নিয়েই আমার কাছে খাদ্য বিক্রী করেছিল, তবুও তার মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠতে দেখে স্বভাবতঃই ভারতীয় কৃষ্টির কথা মনে পড়ল। বিদায় নেবার বেলা মাথায় টুপি রেখেই তাকে আমি যুক্তকরে নমস্কার করলাম। পাঠানও আমাকে নমস্কার বলে জোড়হাত করতে ভুলেনি। কিন্তু আমাদের আচার-ব্যবহারের কথা মনে হওয়ামাত্র মাথা নত হয়ে এল। অনেক দুঃখ হ'ল কিন্তু প্রতিবাদের উপায় ছিল না; ভাবছিলাম কবে স্বাধীন হব এবং পাঠানদের মত উদার-চিত্তে উপবাসের দিনেও একজন পাঠানকে নিজের ঘরে বসিয়ে খাওয়াতে পারব।

দোকান থেকে বেরিয়ে পথে দাঁড়ালাম; তারপর মাইল পাঁচেক যাবার পর দূর থেকে একটি টিলার উপর একটি বাংলো ধরণের বাড়ী দেখতে পেলাম। এদিকে পথ যদিও প্রশস্ত এবং সমতল, তবুও অযত্নের জন্য বড় বড় পাথর পথকে দুর্গম করে রেখেছে। খুব কষ্টে সাইকেল ঠেলে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় একজন সেপাই আমাকে বাংলোয় যাবার জন্য ইংগিত করলে। বিনা বাক্যব্যয়ে তার অনুসরণ করলাম। বাংলোতে যাবার পর একজন অফিসার পরিষ্কার হিন্দুস্থানীতে আমার সংগে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। হিন্দুস্থানী ভাষা উর্দুও নয় হিন্দিও নয়, এ দু'টার মাঝামাঝি। হিন্দুস্থানী রোমান অক্ষরে সাধারণত লেখা হয়; এই ভাষা ভবিষ্যতে রোমান অক্ষরে লিখিত হয়ে ইণ্ডিয়ার রাষ্ট্রভাষা হবে, এতে কোন সন্দেহ নাই।

অফিসার অনেকদিন হংকং-এ ছিলেন। তাঁর পোশাক দেখেই অনুমান করেছিলাম তিনি একজন উঁচুদরের অফিসার হবেন। আমার ধারণা যে ঠিক তা তাঁর সংগে কথাবার্তাতেই বুঝতে পেরেছিলাম। আফগানিস্থানে যাদের সংগে পরিচিত হয়েছিলাম তাদের অধিকাংশই ঈশ্বরের নামে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। কিন্তু এই অফিসারটি আমাকে জানালেন শুভেচ্ছা।

কাবুল, কান্দাহার, গজনী ইত্যাদি ভ্রমণ করে আফগানিস্থানের সৈনিক বিভাগের অনেক কথাই পরে জেনেছিলাম। আফগানিস্থানে নানা শ্রেণীর লোকের বাস। কতকগুলি সম্প্রদায় মিলে আফগান জাতের গড়ন হয়েছে। সমস্ত সম্প্রদায়ই একই ধর্মের অন্তর্গত নয়, একই সম্প্রদায়ে আবার বিভিন্ন ধর্মও আছে। যেমন হিলজাই সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। ওরা যখন স্বগ্রামে বসবাস করে, তখন নিজেদের সুবিধার্থে হিন্দু এবং মুসলমান বলে পরিচিত হয়, কিন্তু বিদেশে গেলে সবাই হিলজাই বলেই পরিচয় দেয়। আমাদের দেশে যত কাবুলিওয়ালা দেখতে পাই তাদের মধ্যে অনেক হিন্দু আছে, আমরা তাদের চিনতে পারি না। আমাদের কাছে এরা সবাই পাঠান ও মুসলমান।

লোকসংখ্যা অনুযায়ী প্রত্যেক সম্প্রদায়ই দেশরক্ষার্থে সেপাই সরবরাহ করতে বাধ্য। সম্প্রদায়ে কত হিন্দু কত মুসলমান আছে তার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আফগান সরকার ভাল করেই অবগত আছেন কোন্ সম্প্রদায়ে লোকসংখ্যা কত। তাঁরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মণ্ডলকে জানিয়ে দেন যে তাকে এত সেপাই বৎসরে দিতে হবে। মণ্ডল আদেশ পাওয়ামাত্র নির্ধারিত প্রথামত সেপাই সরবরাহ করেন। এতে সম্প্রদায়ের হিন্দুরা বাদ পড়ে না। হিন্দুরা সাধারণত সেপাই-এর কাজ করে না, তারা নিজের সম্প্রদায় হতেই ভাড়া করে লোক পাঠায়। এরূপ ভাড়াটে সেপাই সরকার হতে প্রাপ্য মাইনে তো পায়ই, উপরন্তু যে তাকে ভাড়া করে পাঠায় সেও মাইনে দেয়। এই ভাড়াটে সেপাইদের

সংগে অন্য যে-কোন পরাধীন দেশের সেপাই-এর সংগে তুলনা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যারা ভাড়াটে নয় তারা নিঃশংকচিত্তে আপন আপন কাজ করে যায়। অফিসারদের সামনেই তারা সিগারেট ফুঁকছে, হাসি ঠাট্টা করছে। কিন্তু ভারাটে সেপাইরা সকল সময়ই সন্ত্রস্ত, এদের এই আড়ষ্টভাব অফিসারগণও পছন্দ করেন না। ব্যারাক হতে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করে আবার পথে এলাম।

ব্যারাক হ'ল একটি ঘাঁটি। যে কেউ আফগানিস্থানে যাক, তাকেই এখানে গিয়ে প্রশ্নের জবাব দিয়ে আসতে হয়। আমাকে কোন প্রশ্ন করা হয়নি দেখে মনটা বেশ উৎফুল্ল হয়েছিল। পর্যটকের বেশ আদর আছে বলে মনে হ'ল। পূর্বেই বলেছি আফগানিস্থানে ভারতের লোক অতি অল্পই যায়। অফিসারের সংগে কথা বলে জেনেছিলাম, আমার আফগানিস্থান প্রবেশ করার পূর্বে তিনজন পারসী যুবক সাইকেলে কয়েক মাস পূর্বে এসেছিলেন এবং তার ছয় বৎসর পূর্বে একজন বাঙালী বৈষ্ণব একতারা হাতে করে, হরিনাম গাইতে গাইতে কাবুল গিয়েছিলেন। গত ছয় বৎসরের হিসাব মতে আফগানিস্থানে পর্যটক হিসাবে আমি হলাম পঞ্চম ব্যক্তি। আফগানিস্থানে পর্যটকের স্থান সাধারণ লোক হতে অনেক উচ্চে, এই বিষয়টি পরে জেনেছিলাম।

সাইকেল চলছে। আমার পায়ে শক্তি আছে। নতুন দেশের নতুন গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে পথ চলছি। আফগান জাতের কথা, তাদের দেশের আবহাওয়ার কথা একটার পর একটা মনে আসছিল। ভয়ানক অনুতাপ হচ্ছিল আফগানিস্থান সম্বন্ধে নানা বিকৃত এবং কল্পনাপ্রসূত কাহিনী এককালে বিশ্বাস করেছিলাম বলে। আফগানিস্থানে এসে দেখছি এ-সব মিথ্যা এবং গাঁজাখুরি গল্প। কোথায় ডাকাতের অত্যাচার আর কোথায় হিন্দু-বিদ্বেষ? কেউ তো এখনও এল না আমাকে কল্‌মা পড়িয়ে মুসলমান করতে। মনে মনে মিথ্যা রটনাকারীদের কঠোর ভর্ৎসনা করে সাইকেলে

পেডেল করছিলাম। দু' একখানা পর্ণকুটীর পথের পাশে দেখতে পেলাম। কুটীরগুলির কাছে গিয়েছি, কুটীরবাসীদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি ওদের মনোভাব জানবার জন্য। কিন্তু কই কেউ তো আমাকে হত্যা করলে না? অনেকের বাড়ীতেই ছোরা এবং ছোট বন্দুক ছিল, কিন্তু আমাকে তা দিয়ে আক্রমণ করেনি।

আমাদের দেশে যেমন করে সূর্য অস্ত যায়, ওদের দেশেও ঠিক তেমনি সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আমি ডাক্কা নামক ছোট একটি গ্রামের কাছে পৌঁছলাম। দূর হতে গ্রামের প্রকৃত চেহারা মালুম হল না। গ্রামে শ্রী ছিল না। গ্রামে প্রবেশ করে বুঝলাম সত্যই গ্রাম শ্রীহীন।

রাত্রে থাকার জন্য গ্রামের প্রায় সমুদয়টাই ঘুরলাম। শেষটায় যখন কোথাও স্থান পেলুম না, তখন কুমিদানের অফিসে গেলাম। আমাদের দেশে যেমন পাঁচ-সাতটা গ্রাম নিয়ে একটা পুলিশ স্টেসন থাকে, আফগানিস্থানে কিন্তু তা নয়। এখানে প্রত্যেক গ্রামেই একজন করে দারোগা আছেন। দারোগাকে কুমিদান বলে। ডাক্কার কুমিদান একজন যুবক। তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। দেশ-বিদেশের সংবাদ অবগত হবার জন্য নানারূপ প্রশ্ন করলেন। তাঁকে আমার অভিজ্ঞতা বলবার পর বিনয়সহকারে জানালাম, আমি এখানকার হিন্দুদের অবস্থা জানতে চাই, যদি দয়া করে সে-বিষয়ে সাহায্য করেন তবে বাধিত হব। আমার প্রস্তাব শুনে কুমিদান খুব সন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হ'ল না।

যা হোক, তিনি একজন লোক আমার সংগে দিয়ে হিন্দুদের বাড়ীর দিকে পাঠিয়ে দিলেন। রাত্রের অন্ধকারে কয়েকটি হিন্দু বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম এরা নির্জীবের মত দিন কাটিয়ে যাচ্ছে। এদের শরীরে তেজবীর্য আছে বলে মনে হয় না। প্রত্যেকের শরীর রুগ্ন এবং দেখলেই মনে হয় আয়েসী। ওরা আমাকে একটুও প্রীতির চক্ষে দেখলে না। তারা হয়তো এই ভেবে

শংকিত হচ্ছিল যে আমি তাদের বাড়ীতে থাকতে গিয়েছি। একজন হিন্দুকে দেখে যারা শংকিত হয়, অতিথি গ্রহণে ভীত হয়, তাদের বাড়ীতে থাকা পাগলের পাগলামী ছাড়া আর কি হতে পারে। অবশেষে কুমিদানের বাড়ী ফিরে এলাম।

ফিরে এসে দেখলাম কুমিদানের মুখ ভার। এখানকার হিন্দুরা মুসলমানের বাড়ীতে খায় না, সেজন্য কুমিদান আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার জন্য ভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। কুমিদান স্থন্নি মুসলমান। তাঁকে চিন্তান্বিত দেখে বললাম, মহাশয়, আমি হিন্দুদের বাড়ীতে গিয়েছি বলে হয়তো ভেবেছেন আমি ওদের মতই মনোবৃত্তি পোষণ করি—এটা আপনার ভুল ধারণা। আমি গিয়েছিলাম, এখানকার হিন্দুরা কেমন করে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে তা দেখতে। যদি দেশে গিয়ে বলতে পারি, নতুনের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে শুধু পুরাতন আচার-পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে থাকলে কি করে একটা জাত ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হতে থাকে, তাতে হিন্দুদের উপকার হতে পারে। এই হতভাগারা টাকার কুমীর, অথচ কৃপণ। ওরা নিজেদের স্বাস্থ্যের জন্যও টাকা খরচ করে না, টাকা খরচ করে স্বর্গে যাবার জন্য। এদের মুখে হাসি নেই, এরা অতিথি দেখলে ভয় পায়। এদের এই অবস্থা মরবার পূর্বলক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। সনাতনী হিন্দুরা নিজের ধ্বংসের কারণ না অন্বেষণ করে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়েই সুখী হয়। আফগানিস্থানের শিয়া শ্রেণীর মুসলমানও মাইনোরিটি, তারাও পাঠানদের পছন্দ করে না, কিন্তু তাদের সামাজিক রীতিনীতিতে গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকায় পাঠানদের একটুও ভয় করে না। সনাতনী হিন্দুদের যদি গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকত, তবে কখনও পাঠানের ঘাড়ে সকল দোষ চাপিয়ে দিয়ে মুখ বুজে থাকত না।

খাওয়ার বন্দোবস্ত হ'ল। খেতে বসলাম। ভাত, দুম্বার মাংস এবং কাঁচা পেঁয়াজ। ভাতে ঘি দেওয়া ছিল না। হিন্দুরা চাউলে ঘি মাখিয়ে রান্না করে, এতে অগ্নিমান্দ্য হয়। কিন্তু সাদা ভাতে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। খেতে

বসে মাংস এবং ভাত কুমিদানের চেয়েও দ্বিগুণ খেতে সক্ষম হয়েছিলাম। যদি কুমিদান আমার শক্তির পরিচয় চাইতেন, তবে তাঁকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করতে বেগ পেতে হত না।

আফগান জাতকে যারা নিষ্ঠুর নরঘাতী বলে চিত্রিত করেছে, তাদের প্রতি ঘৃণা হয়েছিল এবং আহারের পর কুমিদানকে আফগানিস্থান সম্বন্ধীয় সেই সব মিথ্যা রটনাগুলির কথা বলেছিলাম। শুনে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, এ তো সামান্য কথা, পৃথিবীতে কত হীন মিথ্যাবাদীই আছে যারা তিলকে তাল করে লোকসমাজে প্রচার করে। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, আফগানিস্থানের পাঠানদের বিরুদ্ধাচরণ সনাতনী হিন্দুরাই বেশী করেছে।

পরদিন অল্প সময়ই গ্রামে ছিলাম। এই সময়টুকুতেই বুঝতে পেরেছিলাম, গ্রামের ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুদের খুশী করার জন্য গ্রামের ভেতর কোন মুসলমান গোহত্যা করে না। গোহত্যা হয় গ্রামের বাইরে বহুদূরে। কাটা মাংস গ্রামে গোপনে আসে, এবং গোপনেই বিক্রী হয়ে থাকে। আফগানরা এমনিভাবেই হিন্দুদের মনস্তুষ্টি করে থাকে। অথচ আজ যে হিন্দু যুবতী নিষিদ্ধ মাংস দেখে বমি করে, সেই রমণী যখন শরীরের ক্ষুধা মেটাবার জন্য গ্রামের কোন মুসলমান যুবকের সংগে চলে যায়, তখন আর ভক্ষ্যাভক্ষ্যের কথা মনে থাকে না। উদারতার গুণে কোন কোন হিন্দু উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে, পক্ষান্তরে ঐ গুণটির অভাবে অনেকে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে।

ডাক্কা গ্রাম পরিত্যাগ করার পূর্বে স্থানীয় বাড়ীঘরের দিকে একটু লক্ষ্য করতেই দেখতে পেলাম, অনেক বাড়ীর দেওয়ালে বন্দুকের গুলিবিদ্ধ হয়ে যে ছিদ্র হয়েছিল, তা এখনও বন্ধ করা হয়নি। ভবিষ্যৎ বংশধরদের দেখাবার জন্যই হয়তো গুলিবিদ্ধ দেওয়ালগুলি যেমন ছিল, তেমনি অবস্থায়ই রাখা হয়েছে। এরূপ কয়েকটি ঘর দেখার পর চিন্তিত হয়ে পড়লাম, কারণ এই ছিদ্রগুলি ভারতীয় সেপাইদের কুকীর্তির নিদর্শনচিহ্ন। ভারতীয় সেপাই-এর

বিরুদ্ধে পাঠানদের মনে বিদ্বেষ চিরদিন জাগরূক থাকবে, এটা নিশ্চিত। এ দৃশ্য আমি আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম না, গন্তব্যপথে রওনা হলাম।

গ্রাম পার হয়েই বড় রাস্তায় আসলাম। রাস্তা প্রশস্ত। পথের একদিকে ঢালু সমতলভূমি, অন্যদিকে দূরে কৃষ্ণাভ পর্বতমালা। অনেকক্ষণ সেই দৃশ্য দেখলাম। মনে হল, পর্বত বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ বলেই হয়তো ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে, কিন্তু শেষে বুঝতে পারলাম আমার ধারণা সত্য নয়। এদিকের পর্বতে বৃক্ষের বড়ই অভাব। পর্বতের নিজেরই কৃষ্ণ ছায়া পড়ে পর্বতকে অন্ধকার দেখাচ্ছে।

পর্যটকের অগ্রগতিকে মাঝে মাঝে ব্যাহত করে এই সব মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য—যাহা পথের দু'ধারে অপরূপ ঐশ্চর্যশালিনী হয়ে রয়েছে। অনেকক্ষণ সেই সৌন্দর্য দেখলাম। হঠাৎ মনে হ'ল আমি রাজপথে দাঁড়িয়ে আছি। এদিকে হোটেল নাই, খাবারের দোকান নাই—আশ্রয় নিতে হবে।

সৌন্দর্যের মায়াপুরীর মোহ কাটিয়ে আবার চললাম বন্ধুর পথের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে। পথ দুর্গম। কিন্তু তাই বলে কি পথ চলা বন্ধ করতে পারা যায়?

সাত মাইল যাবার পর একটা ছোট্ট গ্রাম পেলাম। গ্রামে লোকজনের বসতি কম। গ্রাম উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। পথের দু'পাশে মাটির ঘর। এখানে গৃহনির্মাণ-পদ্ধতি আমাদের দেশের মত নয়। আমাদের দেশে ঘরগুলি ক্রমেই পথকে গলা টিপে মারতে চেষ্টা করে, আর ওদের ঘরগুলি ক্রমেই সরে পথকে প্রসারিত করে দিচ্ছে। আর্য-সংস্কৃতির এটাই বিশেষত্ব।

গ্রামে বেশীক্ষণ দাঁড়ালাম না, আরও এগিয়ে গিয়ে সন্ধ্যার মধ্যে জালালাবাদ পৌঁছতেই হবে। সেইখানেই রাত্রিবাস করব মনস্থ করেছিলাম। সেজন্য গ্রামটার ভেতর প্রবেশ করে অল্পক্ষণ মাত্র ঘোরাফেরা করে দেখলাম। গ্রামে লোক ছিল না। পরে শুনেছিলাম, এই গ্রামে শিয়া শ্রেণীর লোক বাস

করে। আফগানিস্থানের শিয়ারা অন্য জাতের লোক। ওরা জাতে মোংগল বা মোগল। ভাষাও ওদের পৃথক। এরা আলু চাষ করতে বেশ পটু। তখন নাকি আলু উঠিয়ে আনার সময় ছিল ; সেজন্য গ্রামের লোক সপরিবারে আলুর ক্ষেতে চলে গিয়েছিল।

এদের গৃহনির্মাণ-পদ্ধতি পাঠানদের মত নয়। এখনও এরা আদিম মোংগল জাতির মতই ঘর তৈরী করে। আদিম মোংগল ধরনের ঘর ভারতের বাইরে সর্বত্রই দেখা যায়। ভারতের মধ্যে এখনও বাংলা, আসাম এবং উড়িষ্যাতে মোংগল পদ্ধতির ঘর বিরল নয়। পুরীতে যারা জগন্নাথদেবের মন্দির দেখতে যান তাঁরা যদি পূজারীদের ঘরগুলি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেন, তবেই বুঝতে পারবেন মোংগল ধরনের ঘর কি রকমের হয়। এশিয়ার অনেক দেশে মোগলদের বসবাস দেখেছি। চেংগিজ খান মোগল ছিলেন। পৃথিবীর সভ্য সমাজ এখনও তাঁর নাম শুনলে আতংকে কম্পিত হয়। হিন্দুস্থানের শাহান্‌শা আকবরের নাম আমাদের দেশে কে না জানে? কিন্তু গ্রাম্য মোংগলদের চাল-চলন ও দরিদ্রতা দেখলে লজ্জা হয় এবং মনে হয়, এদেরই পূর্বপুরুষ কি অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষকে পরাজিত করেছিল এবং বহু বৎসরব্যাপী রাজত্ব করেছিল?

গ্রাম পরিত্যাগ করে পথে এলাম। পূর্ণ উদ্যমে সাইকেল চালাতেছিলাম। বিকালের দিকে একখানা মাঝারি গোছের গ্রামে এলাম। এ-সব গ্রামে থাকবার কোন কষ্ট নেই। কেন কষ্ট পেতে হয় না, সে সম্বন্ধে দু'-একটি কথা বলা দরকার মনে করি। রাত্রে আফগানিস্থানের পার্বত্য অঞ্চলে ভয়ানক শীত অনুভূত হয়। শীতের সময় বাইরে থাকা অসম্ভব। গরমের সময় বাইরে ঘুমাতে হ'লে কম্বলের দরকার হয়। গ্রামে মুসাফিরখানা ছিল না ; সেজন্য রাত কাটাবার জন্যে আমাকে মসজিদে আশ্রয় নিতে হ'ল। যিনি মসজিদে আজান দেন তাঁরই সংগে আমার সর্বপ্রথম আলাপ হয়। তিনি আমার বাড়ী কোথায় এবং

আমি কোন্ ধর্মের লোক জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে বললাম—এইমাত্র জেনে রাখুন আমি মুসলমান নই। মুসলমান নই শুনে তিনি একটুও দ্বিধাবোধ করলেন না। তাড়াতাড়ি করে মসজিদের এক কোণে একটি লম্বা তাকিয়া, ছোট তোশক এবং কম্বলসমেত একটি লেপ এনে দিলেন, আর আমাকে বাইরে রুটির দোকানে খেয়ে আসতে বললেন। তাঁর নির্দেশমত আমি রুটির দোকানে যেয়ে ঢুকলাম। তারপর আমি যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলাম, তখন মোল্লা আমাকে জাগালেন এবং বললেন, এখন আর রাত নেই, আজান করা হবে। আপনি হয়ত ঘুমের মাঝে হঠাৎ ভয় খেয়ে যাবেন, সেজন্যই ডেকে দিলাম।

একবার ঘুম ভেংগে যাবার পর আর ঘুমাতে ইচ্ছা করে না। উঠে বসলাম এবং একটা সিগারেট ধরিয়ে নানা কথা ভাবতে আরম্ভ করলাম। হিন্দুস্থানের মুসলমানদের মতে আমি কাফের, আমাকে কলমা পড়িয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা তাদের পক্ষে একটা বিশেষ পুণ্যের কাজ; কিন্তু এখানে দেখছি তার বিপরীত। এখানে লোকের সাধারণ বুদ্ধি আছে বলেই মোল্লা আমাকে ডেকে উঠিয়েছিলেন। সাধারণ বুদ্ধি সহজে আসে না। সাধারণ বুদ্ধির বিকাশ হয় ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে। যে দেশ এবং যে জাতি স্বাধীন, তাদের জীবন ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়েই কাটে।

পূর্বদিকে মাথা রেখে শুয়েছিলাম। মোল্লা সেজন্য প্রতিবাদ করেননি। এমন কি কেউ ভ্রূক্ষেপও করেনি। পরদিন প্রাতে বিদায়ের সময় মোল্লা বলেছিলেন, আপনার অনেক অসুবিধা হয়েছে নিশ্চয়ই, সেজন্য ক্ষমা করবেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের গ্রামে মুসাফিরখানা নেই।

মোল্লাকে আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম। বেশী কথা বলবার সময় ছিল না। তখন স্বদেশের কথা চিন্তা করছিলাম। ভাবছিলাম স্বাধীনতার কত গুণ। পরাধীন ভারতের জাতিভেদের বিরুদ্ধে আমার হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। পরাধীন ভারতের মুসলমানরা বর্ণহিন্দুদের গোঁড়ামি

বেশ ভাল করেই নকল করেছিল। তারা স্বাধীন মুসলমান দেশগুলির পদাংক অনুসরণ করা দূরের কথা, নিজেদের আদর্শ ভুলে গিয়ে সর্বনাশের পথেই এগিয়ে চলেছিল।

আজ যদি এটা আফগানিস্থানের মসজিদ না হয়ে ভারতের কোন মন্দির অথবা মসজিদ হ'ত, তবে আমাকে এই শীতের রাতে বাইরে শুয়ে নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হতে হ'ত। মন্দিরের গোঁড়া পুরোহিত এবং মসজিদের মোল্লা কেউ আমার বিরুদ্ধ আচরণকে উদার দৃষ্টিতে দেখতে পারত কিনা সন্দেহ। এ-সব কথা যতই ভাবতেছিলাম ততই মন বিগড়ে যাচ্ছিল; কিন্তু কালাপাহাড়ী যুগ চলে গিয়েছে। নতুন যুগের নতুন চিন্তা-পদ্ধতির সাথে তাল রেখে নতুনভাবে আমাদের চলতে হবে। মন্দির বা মসজিদের ইট-পাথরকে না ভেংগেও ধর্মগত, সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার উচ্ছেদ করে মন্দির বা মসজিদকে আমরা বৃহত্তর মানবতার উদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। তা যদি না পারি, তবে জাতি হিসেবে আমরাও একদিন মন্দির বা মসজিদের ভঙ্গুর ইট-পাথরের মতই জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে ভূগর্ভে সমাধি লাভ করব।

এমনি ধরনের চিন্তা করে যখন পথ চলছিলাম, হঠাৎ কোথা হতে একটা বুলডগ্ আক্রমণ করল। বুলডগের চরিত্র জানতাম, সেইজন্যই সাইকেল হতে নেমে পড়লাম। বুলডগের আক্রমণ এবং নেকড়ে বাঘের আক্রমণ একই রকমের। সাইকেল হতে নেমে দাঁড়াতে দেখে বুলডগ্‌টা একটু থমকে দাঁড়াল এবং পরে কাছে এসে আমার গা শুঁকতে লাগল, কিন্তু কামড়াল না। আফগানী বুলডগের একটা সহজ বুদ্ধি আছে। চোর-ডাকাতকে ওরা চেনে এবং তাদের আটকে রাখে এবং কামড়ায়ও। তবে আফগানিস্থানে বুলডগের সংখ্যা খুবই কম। শীতের সময় যখন সাইবেরিয়া হতে নেকড়ে বাঘের দল আফগানিস্থানে অভিযান চালায়, তখন অনেকেই তাদের বুলডগ্‌কে ঘরে বেঁধে রাখে। অনেকে আবার ছেড়েও দেয়। যারা ছেড়ে দেয় তাদের বুলডগ্ কচিৎ ফিরে আসে।

নেকড়ের দল বুলডগ্ খেয়ে ফেলে। যদি কোনও একটি ফিরে আসে, তবে খালি মুখে সে ফিরে আসে না, নিহত নেকড়েকেও জয়ের চিহ্নস্বরূপ মুখে করে নিয়ে আসে।

বুলডগের সামনে যখন পাথরের মত দাঁড়িয়েছিলাম, তখন একজন লোক সম্ভবত আমাকে বিপন্ন ভেবেই বুলডগ্‌টার দিকে তেড়ে এলেন। কাছে এসেই বুলডগ্‌টাকে এমন এক চপেটাঘাত করলেন। আঘাত পেয়ে কুকুরটা একটু দূরে দাঁড়াল। ভদ্রলোক প্রৌঢ়, জাতে খিলজাই। তাঁর দেহ দীর্ঘ, বুক উঁচু, মাথায় লম্বা চুল, দাড়ি কামানো। বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে তিনি বললেন,—এভাবেই বুল-ডগের হাত হতে বাঁচতে হয়। আপনি কে এবং যাবেন কোথায়? আমি বললাম, "আমি একজন বাঙালী, বেরিয়েছি পৃথিবী ভ্রমণ করতে।"

আফগানিস্থানকে সকল সময়ই ভারতেরই একটি অংশ বলে মনে করেছি; সেজন্যই আফগানিস্থানে ইণ্ডিয়ান অথবা অন্য কোন প্রচলিত শব্দে নিজের পরিচয় দেই নি।

আফগানিস্থানে উর্দু ভাষার প্রচলন শুধু হিন্দুদের মাঝেই আবদ্ধ, কিন্তু অন্যান্যরা হিন্দুস্থানীই জানে এবং উর্দু মোটেই পছন্দ করে না। নমুনাস্বরূপ দু'-একটি কথা বলতে পারি। মুসলমানরা বলে—তোমারা নাম কিয়া হায়? তুম কিদার যাওগে? তোমারা কাম বন্ যায়েগা। হিন্দুরা বলে,—ইস্‌মে সরীফ? আপকা দৌলতখানা? আপ কামইয়াব হো যাওগে। আফগানিস্থানে হিন্দুস্থানী এবং উর্দুর স্রোত ভারত হতে যায়নি, ইরান হতে এসেছে।

ইরান এবং আফগানিস্থানের মধ্যে সীমানা নিয়ে ঝগড়া হয়; সেজন্যই পাঠানরা ইরানী শব্দ ব্যবহার পছন্দ করে না, তারা চায় পোস্ত শব্দ ব্যবহার করতে। দুঃখের বিষয়, ইরানে গিয়ে দেখলাম ইরানী ভাষা হতে আরবী শব্দের ব্যবহার পরিত্যাগ আরম্ভ হয়েছে। ফলে ইরানে এবং আফগানিস্থানে ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ, জার্মান এবং পুরাতন ভাষার ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে।

আমার উদ্ধারকর্তা পাঠান খিলজাই গোষ্ঠীর। খিলজাইরা বড়ই অতিথি-পরায়ণ, কিন্তু প্রথমত তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে রাজী হইনি। ভাবছিলাম জালালাবাদ অতি সন্নিকট, সেজন্য তাঁকে বলছিলাম আজই জালালাবাদে পৌঁছানো দরকার। পাঠান হেসে বললেন, আজ কেন—আগামীকল্যও জালালাবাদে পৌঁছানো সম্ভব হবে না, অতএব চলুন আমার বাড়ীতেই।

আমার কাছে আফগানিস্থানের ছোট একখানা মানচিত্র ছিল। তা দেখে বুঝতে পারিনি জালালাবাদ কত দূর; তাই অগত্যা পাঠানের বাড়ী অতিথি হলাম। পাঠানের বাড়ী নিকটস্থ একটি ছোট গ্রামে। ভাবছিলাম গ্রাম কাছেই। কিন্তু গ্রাম ছিল বেশ দূরে এবং পাহাড়ের অন্তরালে। পথের পাশে গ্রাম করে সেখানে বাস করা এদের অভ্যাস নেই। গ্রাম্যপথে সাইকেল নিয়ে চলাফেরা করা বড়ই কষ্টকর কাজ। পাঠানের যদিও কষ্ট হচ্ছিল না, আমার কিন্তু ঘাম বেরিয়ে গিয়েছিল।

পাঠান ধনী নন্, অবস্থা অসচ্ছলও নয়। তাঁর ফলের বাগান ও ঘাসের জমি পরিমাণে খুব কম নয় বলেই মনে হ'ল। পাঠান বিবাহিত। বাড়ীতে আর একটি যুবককে দেখে ভেবেছিলাম, এই লোকটি হয়ত গৃহস্বামীর ছোট ভাই হবে; কিন্তু সেই লোকটি একজন জায়গীরদার মাত্র। জায়গীরদার মানে হ'ল, যে শুধু খায়, থাকে এবং বাড়ীর কাজকর্ম দেখাশোনা করে। আফগানিস্থানে জায়গীরদার হওয়ার সম্মানের বিষয় নয়—সকল সময়ই মাথা নত করে থাকতে হয়। এজন্য পারতপক্ষে কেহ জায়গীরদার হতে রাজী হয় না। জায়গীরদার পৃথক একটা কামরায় থাকেন। অতিথি-অভ্যাগত এলে জায়গীরদার নিজের ঘর ছেড়ে চলে যান না, তার ঘরেই অতিথির থাকবার বন্দোবস্ত হয় এবং তিনিই অতিথির আদর-যত্ন করেন।

আমার যাবার আধ ঘণ্টা পরেই জায়গীরদার হাতমুখ ধোওয়ার জল দিলেন। একখানা ভাল কার্পেটের ওপর সাদা চাদর বিছিয়ে খাবারের জায়গা করলেন।

তারপর ভিতর-বাড়ী হতে যা নিয়ে এলেন দেখে জিহ্বা হতে সহস্র ধারায় জল বের হয়ে আসছিল। কি সুন্দর মোলায়েম ভাত এবং তার পাশেই বড় বড় করে দুম্বার কাবাব। পাঠান বাইরে ছিলেন, তিনি এসেই হাত ভাল করে ধুলেন। হাত ভাল করে ধোওয়া হয় মাটির সাহায্যে। এখনও আফগানিস্থানের সর্বত্র সাবানের প্রচলন হয়নি, এখনও আফগান জাত প্রকৃতির অনুগত; সেজন্যই মাটির সাহায্যেই তারা হাত পরিষ্কার করে। সাবান কখন যে মাটিকে বেদখল করবে, পাঠানদের উপরই তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

ক্ষুধার সময় উত্তম খাদ্য পেলে লোকে আকণ্ঠ আহার করে। আমিও তাই করলাম। আহার সমাপ্ত হওয়ার পর পাঠান দেশ-বিদেশের গল্প শোনার জন্য গ্রামের লোকদের ডেকে আনলেন। দেখে আশ্চর্য হলাম, সেই গ্রামে একজন বাঙালীও ঘরবাড়ী বেঁধে স্থায়িভাবে বসবাস করছিলেন। এই ভদ্রলোক ঘরের এক কোণে বসেছিলেন এবং আমাদের দেশের অনেক খুঁটিনাটি প্রশ্ন করতেছিলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে আমায় রীতিমত বেগ পেতে হচ্ছিল। শেষটায় উপায়ান্তর না দেখে নিজের ভাষায় বললাম,—যদিও আপনার পরনে কাবুলি পোশাক, পোস্ত ভাষায় অনর্গল কথা বলছেন কিন্তু আপনি আমাকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত অভিজ্ঞতা আমার নেই। আমি কলিকাতার বাসিন্দা অথবা একসঙ্গে দু'মাসও কলিকাতায় থাকিনি। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি অথবা বিপিন পাল মহাশয়ের দর্শন পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তারপর অন্যান্য যে সকল বিপ্লবী-নেতার নাম করলেন তাঁদের নামও শুনতে পাইনি। আমি পাড়াগাঁয়ের লোক। ছিটকে এসে পড়ি একেবারে বেলুচিস্থানে। পল্টনের কেরানীর কাজ করার পর যে সময় পেতাম, সেই সময়ে অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় নিয়েই সময় কাটাতাম। পল্টনের কাজ শেষ হলে চলে যাই সিঙ্গাপুরে, সেখান থেকেই আমার ভ্রমণ আরম্ভ হয়েছে।

অন্যান্য লোকের সংগে কথা শেষ করে তাঁর সংগেই পুনরায় কথা বলতে

আরম্ভ করি। অবশেষে ভদ্রলোক আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন। পাঠান মহাশয়কে সংগে নিয়েই রাত্রে তাঁর বাড়ীতে যাই।

ভদ্রলোক অবিবাহিত। বাড়ীতে দু'টি লোক কাজ করে। উভয়েই প্রৌঢ়। তাঁর বাড়ী দেখে মনে হ'ল, তিনি একজন ধনী এবং আত্মগোপনকারী। সবই দেখতে হয় কিন্তু উপযাচক হয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করতে নেই। তিনি সেখানে কি করেন, কি করে খরচ চলে—জিজ্ঞাসা করিনি, পাঠান মহাশয়কেও এ সম্বন্ধে কিছুই বলিনি। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে সর্বত্র সন্দেহ বিরাজমান, বিশেষ করে যাঁরা বিদেশে লুকিয়ে থাকেন।

খাদ্যের পারবেশন আমাদের প্রথাতেই হয়েছিল। খেতে বসে বাঙালী ভদ্রলোক বললেন, "এখান থেকে একটা পথ রুশ-সীমান্তের দিকে চলে গেছে। পায়ে হাঁটার পথ, সাইকেল চালানো অসম্ভব। আপনার সংগে যদি সাইকেল না থাকত, তবে সেই পথ দেখিয়ে দিতাম অথবা সীমান্ত পর্যন্ত সংগে যেতেও চেষ্টা করতাম। ভদ্রলোকের বদান্যতায় সুখী হয়েছিলাম কিন্তু পথের সন্ধান ছাড়া আর কোন কথাই বলা হয়নি।

পাঠানের বাড়ীতে ফিরে দেখলাম, উত্তম বিছানার বন্দোবস্ত হয়েছে। জায়গীরদার পাশের বিছানায় শুয়ে আছেন। লোকটি বেশ সুপুরুষ। পরে জায়গীরদারদের সম্বন্ধে নানা বিষয় জানতে পেরেছিলাম এবং ভাবতে পারছিলাম না, আফগানিস্থানের মত স্থানে যেখানে আর্য সংস্কৃতির অস্তিত্ব এখনও বর্তমান, সেখানে জায়গীরদার-প্রথা কি করে চলতে পারে। হয়ত অনেকে জিজ্ঞাসা করবেন জায়গীরদারের কাজ কি? এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম এবং আমার ভাষাজ্ঞানও তত নাই যার মারফতে এ-সব কথা বলতে পারি।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি আবহাওয়া একদম বদলে গেছে। প্রভাত-সূর্য ধোঁয়াটে রংএর মেঘের আড়াল থেকে কোনমতে পৃথিবীর অন্ধকার দূর করছে। বাতাস একদম বন্ধ। তুষারপাত সম্ভবই হবে। লক্ষণ দেখে

অনুমান করলাম, তুষারপাত শুরু হতে দু'সপ্তাহ লাগবে। এরূপ আবহাওয়া সাইকেলে ভ্রমণের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক। প্রবল বাতাসের সংগেই তুষারপাত শুরু হয়।

সাইকেলটা বাইরে এনে পাঠান এবং তাঁর জায়গীরদারের সংগে করমর্দন করে রওনা হলাম। পথে এসে বুঝলাম পথটা ক্রমেই উঁচু হয়ে চলেছে। একেবারে বেশী দূর যেতে সক্ষম হলাম না। বার বার নামতে হচ্ছিল। যখনই নেমেছি তখনই দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে তার দৃশ্য দেখছি। সে-সব দৃশ্য চিরদিন আমার মনে আঁকা থাকবে। এই পর্বতমালা আফগানিস্থান হতে শুরু হয়নি, শুরু হয়েছে হিমালয় হতে, এবং শেষ হয়েছে ককেশাসে। পার্বত্য জাতির অনেক স্ত্রী-পুরুষকে নির্ভীক স্বাধীনভাবে পাহাড়িয়া পথে বিচরণ করতে দেখলাম। স্বাধীন-ভাবে ভ্রমণকারীদের দু'-একজনের সংগে আলাপ হয়েছিল। তাদের কাহিনী শুনে মনে হচ্ছিল, ভ্রমণে যদি রোমাঞ্চ থাকে তবে ভ্রমণেই আছে কত বিচিত্র সে অভিজ্ঞতা। যা' হোক, বড় পথ দিয়ে চলেছি। ডাকাত আমার মত লোকেরও যদি পিছু নেয়, তবে সে-ডাকাত ডাকাতই নয়—সে চোর অথবা ছেঁচড়। চোর-ছেঁচড়ের ভয়ে যারা ভীত, রোমাঞ্চ অনুভব করবার ক্ষমতা তাদের থাকে না।

আমার পূর্বোক্ত আশ্রয়দাতা পাঠান যা বলেছিলেন তাই সত্য হ'ল। বিকালেও কোন গ্রামের চিহ্নও দেখলাম না, জালালাবাদ আরও কতদূর—কে জানে। চিন্তিত হয়ে পড়লাম। যদি তুষারপাত আরম্ভ হয়, তবে বাইরে থাকা ভয়ানক কষ্টকর হবে। একবার চীনদেশে তুষারপাতের সময় বাইরে ছিলাম। নানারূপ গাছ-গাছড়া থাকায় সেখানে অনেকটা সুবিধা পেয়েছিলাম, কিন্তু এখানে একটি গাছও নেই। অদূরে হয়ত গাছ আছে এই ভেবে তাড়াতাড়ি চলতে-ছিলাম। একটু দূরে একটা পাহাড়ের উপর উঠে দেখি নিকটেই কতকগুলি গাছ। বাড়ীঘর দেখতে না পেলেও গাছ দেখেই মনে শান্তি এল, শরীরে শক্তি এল।

এই বৃক্ষরাজি জালালাবাদের না হোক, অন্তত যে-কোন লোকালয়ের অস্তিত্বের সন্ধান দিচ্ছিল। যতই কাছে যাচ্ছিলাম ততই দু'-একখানা করে ঘর দৃষ্টিপথে আসতেছিল। একজন পথিকের কাছে শুনলাম, জালালাবাদ শহরের কাছে এসে পৌঁছেছি। প্রবল বেগে সাইকেল চালিয়ে শহরে পৌঁছলাম।

শহর শ্রীহীন। লোকজন নেই বললেই চলে। শহরের সামনেই একটি চত্বর। চত্বরটির চারদিকে পাইন বৃক্ষ সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। দু'টি গাছ এতই সুন্দর যে, দেখলেই পাঠানদের সৌন্দর্য-জ্ঞান আছে মনে হয়। গাছ দু'টি সুন্দর ডালপাতায় সমৃদ্ধ হয়ে ক্রমেই আকাশের দিকে উঠছিল। চত্বরের চারদিকে চেয়ে দেখলাম, ছোট ছোট নালা দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। জল স্বচ্ছ। স্বচ্ছ জলে মাছ খেলছে, কাউকে ভয় করছে না। মাছ দেখামাত্রই বাঙালীর জন্মগত সংস্কার মাথাঝাড়া দিয়ে উঠল। ইচ্ছা হ'ল মাছ ধরি, কিন্তু মাছ ধরার সরঞ্জাম কোথায়? সুতরাং মাছ দেখেই সুখী হলাম, মাছ ধরে খাওয়ার বাসনাকে দমন করতে হ'ল।

গাছ এবং মাছের প্রতি আমার খরদৃষ্টি দেখে একজন যুবক আমার কাছে এল। যুবকের পরনে ইউরোপীয় পোশাক। নেকটাইটি বেশ ভালভাবেই আঁটা, মাথায় বোখারার গরম ফেজ। এরূপ ফেজ রুশ দেশে এখনও প্রচলিত আছে। যুবক এসেই আমার জাতি, ধর্ম, নাম, ব্যাবসা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করল। তার সম্বন্ধে আমি কোন কৌতূহল প্রকাশ করি নি। এটা আমার অভ্যাস। যুবককে নিয়ে নিকটস্থ একটা চায়ের দোকানে গেলাম। বলা বাহুল্য, চায়ের দোকানে টেবিল চেয়ার ছিল না। কার্পেট বিছানো ছিল। দলে দলে লোক কার্পেটের ওপর গোল হয়ে বসে চা খাচ্ছিল। নানা ভাষাভাষী লোকের সমাগম দেখলাম। তবে পোশাক তাদের সকলেরই এক রকমের। আমাদের প্রবেশ করতে দেখে কেউ কিছু বললে না। বিদেশী লোক দেখা তাদের

অভ্যাস আছে এবং তারা ভাল করেই জানে কোন্ বৈদেশিক কি মতলব হাসিল করবার জন্য তাদের দেশে আসে। ইতালীয়, জার্মানী, জাপানী এবং বৃটিশরাই আফগানিস্থানে বেশীর ভাগ যায়। রুশরা অতি অল্পই আসে, এবং এলেও তারা জালালাবাদের মত শহরে থাকে না।

দু' পেয়ালা চা নিঃশেষ করে তৃতীয় পেয়ালায় যখন চুমুক দিচ্ছিলাম, তখন আরও কয়েকজন লোক চায়ের দোকানে প্রবেশ করল। তাদের মাথায় মাশাদী কাপড়ের পাগ্‌ড়ী, পরনে পায়জামা, সার্ট এবং ইংলিশ কোট। দেখেই মনে হ'ল এরা ছাত্র। আমার প্রথম পরিচিত লোকটির সংগে তারা করমর্দন করল, তারপর কাছে বসে ইরানী ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করল। এখানে ইরানী ভাষায় কথা বলা আভিজাত্যের লক্ষণ। এদিকে ছাত্র-সমাজে এখনও ফরাসী ভাষার প্রচলন রয়েছে। দু'-একজন দেখা যায় যারা পোস্তু এবং হিন্দুস্থানীই বলে বেশী। হিন্দুস্থানীর অপর নাম উর্দু। উর্দু শব্দের মানে মিশ্রিত। মিশ্রিত ভাষার প্রচলন এখানে বেশ আছে। আমিও মিশ্র ভাষাতেই কথা বলছিলাম। তবে লক্ষ্ণৌয়ে যে মিশ্র ভাষা ব্যবহার হয় এখানে তার প্রচলন নাই।

ইউরোপীয় পোশাক পরিহিত যুবকটি ধর্মে হিন্দু। হিন্দুরা চার ভাগে বিভক্ত—সনাতনী, আর্যসমাজী, নানকপন্থী এবং শিখ। শিখ এবং নানকপন্থীদের মধ্যে প্রভেদ আচার-ব্যবহারেই—ধর্মের দিক দিয়ে কোন প্রভেদ নেই। নানক-পন্থীরা দাড়ি-গোঁফ, হাতে লোহার বালা এবং নেংটি ও কৃপাণ ব্যবহার করে না। শিখরা ধূমপান করে না, কিন্তু তারা সেটি-ও করে। আফগানিস্থানে আর্যসমাজীরা অপ্রকাশ্যেই থাকতে ভালবাসেন, সেজন্য তাঁদের প্রকাশ্যে কোন শ্রেণী নেই—তাঁরা সনাতনীদেরই অন্তর্ভুক্ত। ভেতরে ভেতরে কিন্তু সনাতনী এবং আর্যসমাজীদের মধ্যে এত বিবাদ যে, আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও তত বিবাদ নেই। এই বিবাদের একমাত্র কারণ হ'ল, আর্যসমাজীরা জাতিভেদ মানে না এবং বিধবা বিবাহ করে। বিধবা-বিবাহ এমনিভাবে প্রচলিত যে, তিন-চার সন্তানের

জননীরও এরা পুনরায় বিবাহ দেয় এবং অতি বৃদ্ধ বিধবা ছাড়া অন্য বিধবার মুখদর্শনই পাপ বলে গণ্য হয়। এতে আর্যসমাজীদের সংখ্যা বেড়েই চলছে, আর সনাতনীরা সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হচ্ছে।

চায়ের দোকানে বসে কথা বলা নবাগত যুবকগণ পছন্দ করছিল না। ছোট চায়ের দোকানে বসে গোপন কথা বলা-কওয়া চলে না। নবাগত যুবকদের একজন তাঁর বাড়ীতেই আমাকে নিয়ে যাওয়া সঙ্গত মনে করল। আমরা কাফিখানা পরিত্যাগ করে শহরের দিকে চললাম। একটি ছোট বাজারের ভেতর দিয়ে যেতে হ'ল। কতকগুলি হিন্দু দোকানী বেচা-কেনা করছিল। তাদের শুধু দেখেই গেলাম, কিন্তু কথা বলতে ইচ্ছা হ'ল না। তা বলে আমার হিন্দুপ্রেম ছিল না—একথা বলা চলে না।

পাঠান ছেলেটি আমাকে তার বাড়ীতে একটি রুমে বসাল। রুমখানা ছোট হ'লেও সজ্জিত। একদিকে একটি কাঠের বাক্সের উপর কয়েকখানা বই পড়েছিল, কোরানখানাও সযত্নে কাপড় দিয়ে বেঁধে একটি ছোটখাট তাকে রাখা হয়েছিল। ঘরে একখানাও টেবিল-চেয়ার ছিল না। ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে একটি ছোট গর্ত, তাতে রাত্রে সামান্য পরিমাণ কাঠকয়লার আগুন জ্বালানো হয় এবং যদি বেশী শীত পড়ে, তবে বিছানাটা টেনে নিয়ে তারই কাছে শুতে হয়।

যুবক তার বাবাকে ডেকে আনল। তিনি আমাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করেই বাইরে গেলেন। বুঝলাম ভোজনের বন্দোবস্ত হবে এবং অনেকে নিমন্ত্রিতও হবে। খরচ হবে অনেক এবং যুবককে আমার বক্তব্য বলতে পারব না, সেজন্য তাকে বললাম, "তোমার বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস, পুরাতন প্রথায় অতিথিসেবা মোটেই পছন্দ করি না।" যুবকের বাবা ফিরে এলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—রুটি কি ভাত খেতে ভালবাসি। ভাতই পছন্দ করি জানালাম। এতে তিনি সুখী হলেন। যুবকের পিতা চলে গেলে যুবক চা (চাই) নিয়ে এল এবং সকলকেই চা খেতে দিল। তারপর ভ্রমণ-কথা বলতে আরম্ভ করলাম।

সুখের বিষয়, ছাত্রেরা কখনও জিজ্ঞাসা করেনি, ক'টা বাঘ একসংগে আমাকে আক্রমণ করেছিল ; ডাকাতের দল পথে ওৎ পেতে বসে রয়েছিল কিনা ? তারা জিজ্ঞাসা করেছিল চীন দেশের ছাত্রদের কথা ; জাপানীরা কি সত্যিই হারিকিরি করে নিজের সম্মান, দেশের এবং রাজার সম্মান বাঁচাবার জন্মে ? নতুন ধরনের নতুন প্রশ্ন। জন্মের পর হতেই এরা শুনছে রাষ্ট-বিপ্লবের কথা। এরাও মহৎ উদ্দেশ্যে মরণকে বরণ করতে পশ্চাৎপদ হয় না। বাঘের কথা, ডাকাতের কথার মত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করার মনোবৃত্তি তাদের ছিল না। জাপানীরা কেন হারিকিরি করে, সে বিষয়েই চিন্তা করছিল। যখন শুন্‌ল হারিকিরি হ'ল এক প্রকার পাগলামি, তখন তারা শান্ত হ'ল।

ভ্রমণ-কথা কিছুটা বলার পরই স্থানীয় হিন্দুদের কথা উত্থাপন করলাম। একজন বললে, এরা আজব লোক। সকল সময়ই এদের পরমার্থিক চিন্তা এবং কি করে গ্রামকে গ্রাম করায়ত্ত করা যায় তারই চেষ্টা। এরা কখনও কূটনীতিতে যোগ দেয় না, যখনই যিনি রাজা হন তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করে। গতানুগতিক অবস্থার ব্যতিক্রম ভাবতেও পারে না। সরকারী বেঙ্কের অর্ধেক অংশ হিন্দুদেরই। যত জমি দেখতে পাবেন, সবটারই মালিকানা স্বত্ব তাদের, অথচ তারা নিরীহ এবং সকলকেই ভয় করে চলে।

আমাদের দেশের নবাব সিরাজের কথা এখনও লোকে বলে ; এমন লোকও আছে যারা সিরাজের জন্ম চোখের জলও ফেলে। তারপর যারা আরও একটু উচ্চ-স্তরের, তারা পঞ্চ ব্রাহ্মণ, লক্ষ্মণ সেন, বল্লাল সেন—এদের কথা বলে আসর গরম করে তোলে। আমার জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা সেই সমাজেই। সামাজিক দোষগুণ হতে তখনও রেহাই পাই নি। সেজন্মই বোধ হয় রাজা আমানউল্লার কথা এদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে বড়ই ইচ্ছা হয়েছিল ; কিন্তু এরা কোন রাজার কথা একবারও বললে না। এদের রাজভক্তি এবং প্রজাসুলভ বশ্যতার ভাব নেই, এরা নিজেরাই যেন এক-একজন রাজা। অথচ যখনই কোন স্বদেশবাসীর সংগে

আফগানিস্থানে দেখা হয়েছে, তখনই তিনি রাজাদের চৌদ্দপুরুষের ইতিবৃত্ত বলতে কসুর করেন নি। আমি এই যুবকদের কাছে সেরূপ কিছুই না শুনে একটু দুঃখিত হয়েছিলাম। আমাদের দেশে রাজতন্ত্রের মহিমা প্রচারের জন্যে 'দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা' কথাটা সৃষ্টি হয়েছিল; অতএব আমার মত লোক সেই ধুয়ার জের না টেনে যায় কোথায়? নিজের দেশে যদি রাজা না থাকে, তবে অপরের দেশের রাজার কথা শ্রবণ করেও আমাদের আনন্দ হওয়ার কথা।

পর্যটকের কাজ হ'ল, এক দেশের সংবাদ অন্য দেশে বহন করে নিয়ে যাওয়া। এখানে সংবাদ পাওয়ার বদলে সংবাদ দিতেই হ'ল, সংবাদ পাওয়া গেল না। অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারলাম না, আমানউল্লা কি করে দেশত্যাগী হয়েছিলেন। এমন কি বাচ্চা-ই-সিক্কা কোথায় কিভাবে হত হয়েছিলেন, তাও তারা বললে না। বাধ্য হয়েই অন্যান্য কথা নিয়েই সময় কাটাতে হ'ল। সেই কথাগুলির মধ্যে বোখারার একটি বিশেষ ঘটনা এদের কাছ থেকেই শুনেছিলাম।

বোখারার বিশেষ ঘটনা

উত্তর-পশ্চিম দিক হতে প্রবল বায়ু বইছিল। তুষারপাতের খুবই সম্ভাবনা, তা সত্ত্বেও একটি যুবক বোখারার বিপরীত দিকে একরূপ দৌড়েই যাচ্ছিল। যুবক গন্তব্যস্থানে পৌছবার পূর্বেই তুষারপাত শুরু হ'ল। তুষারপাতে সে অভ্যস্ত বলেই এই দুর্যোগেও চলতে তার কষ্ট হয় নি। সে চিন্তা করছিল তার স্ত্রীর কথা। তার স্ত্রীর অভুক্ত মুখ যখনই মনে পড়ছিল, তখনই তার শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠতেছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে এভাবে চলতে পারল না, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে স্তূপাকৃতি বরফের উপর পড়ে গেল। যুবকের নাম মামুদ।

ওদিকে রুশ দেশের সীমান্তরক্ষীরা যুবককে দূরবীনের সাহায্যে লক্ষ্য করছিল। যুবককে পড়ে যেতে দেখে একজন সীমান্তরক্ষী দৌড়ে এসে তার মুখে ওয়াতকী (রুশ দেশীয় মদ) ঢেলে দিল এবং হাতে দিল কতকটা কন্‌ন্যাক (রুশ দেশীয় কড়া মদ) ঘসে। যুবকের জ্ঞান হ'ল; কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর যখন সে বুঝল যে তাকে মদ খাইয়ে রুশরা বাঁচিয়েছে, তখন রুশদের গালিগালাজ করল। বলল, "মদ খেয়ে জীবন লাভ করার চেয়ে মরাই তার পক্ষে ভাল ছিল।" 'আল্লার' কাছে এই 'হারাম' খাওয়ার জন্যে কি জবাব সে দেবে? কিন্তু সংগে সংগে যেই তার অভুক্ত স্ত্রীর কথা মনে হ'ল, অমনি তার জীবনদানের জন্য রুশীয় রক্ষীদের সে ধন্যবাদ জানাল এবং তাদের করমর্দন করে নিকটস্থ একটা কাফেতে গিয়ে প্রবেশ করল। যুবক তিনদিন অভুক্ত ছিল। অভুক্ত অবস্থায়ও পথ চলেছিল। অভুক্ত পাকস্থলীতে সামান্য মদ পড়াতেই তার নেশা হয়েছিল এবং নিকটস্থ চায়ের দোকানে প্রবেশ করে সামান্য গরম পাওয়াতে মাথায় রক্ত চড়েছিল। মাথায় রক্ত চড়াতে যুবকের জ্ঞান লোপ হয়। যারা চায়ের দোকানে বিশ্রাম করছিল

তারা যুবকের সাহায্যার্থে আসে এবং যখন টের পেল যুবকের মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরিয়ে আসছে, তখনই তারা সরে দাঁড়াল। মাতালকে সাহায্য করা আর নরক-যাত্রার পথ পরিষ্কার করা একই কথা। সুতরাং কেউ তার কাছে থাকল না। পুলিশ ডাকা হ'ল। পুলিশ তাকে বেশ দু' ঘা লাগিয়ে তার অজ্ঞান দেহটাকেই হাজতে নিয়ে পুরে রাখল। একটা সংজ্ঞাহীন লোককে এভাবে হাজতে নিয়ে যেতে দেখেও কেউ কোন প্রতিবাদ করল না।

রাত্রেই মামুদের জ্ঞান হ'ল, কিন্তু তার শরীরে শক্তি ছিল না। ভেজা মেজেতে শুয়ে থাকল। সে ভাবছিল, কেন আমিনাকে সে বিয়ে করেছিল? আমিনা নির্দোষ বালিকা। তারই জন্য সে তার শিয়া পিতার গৃহ পরিত্যাগ করে একজন সুন্নি যুবককে বিয়ে করেছিল। যদি তাদের বিয়ে না হ'ত, তবে আমিনাকে তার পিতা পরিত্যাগ করতেন না, আমিনাও না খেতে পেয়ে আজ মৃত্যুর সম্মুখীন হ'ত না। রাত চারটার সময় মামুদ উঠে বসল। সে আল্লার দরগায় প্রার্থনা করল। প্রার্থনায় বলল, "হে আল্লা, আমি কোন পাপ করি নি, আমাকে বাঁচাও, আমার আমিনাকে রক্ষা কর।"

পরের দিন সকালে মামুদকে কাজির এজলাসে হাজির করা হ'ল। চায়ের দোকানের মালিক সাক্ষ্যে বলল, "মামুদ মাতাল অবস্থায় চায়ের দোকানে প্রবেশ করার পরই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আমরা তাকে সাহায্য করতে গিয়েছিলাম কিন্তু তার মুখে মদের গন্ধ ছিল; সেজন্য পুলিশে সংবাদ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। হারামখেকোকে স্পর্শ করে কে নরকের পথ প্রশস্ত করবে বলুন, খোদাবন্দ (ধর্মাবতার)?"

সাবাস্ সাবাস্ উচ্চ নিনাদ হ'ল।

কাজি একরূপ চোখ বুজেই মামুদকে দু'মাসের সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিলেন।

মামুদকে জেলে নেওয়া হ'ল। কাজি ভাবলেন—আপদ বিদায় হ'ল, যেরূপ শীত পড়েছে তাতে আরও একটু হারাম না খেলে শরীর রক্ষা করা যাবে না।

তাড়াতাড়ি করে কাজি গৃহে ফেরলেন এবং এক গ্লাস আরক খেয়ে গোঁফে তা দিয়ে বললেন, কি আরাম!

গরীব লোকের কাছে আরকের অপর নাম সরাব এবং ধনী লোক যখন সরাব গলাধঃকরণ করেন, তখন তার নাম হয় আরক। মামুদ যদি সেই সংবাদটি রাখত, তবে তার এই বিপদ হ'ত না।

মামুদ এবং আমিনা একই গ্রামের বাসিন্দা। গ্রামের লোক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—মোগল এবং পাঠান। পাঠান সংখ্যায় কম, আর মোগল সংখ্যায় বেশী। মোগল শিয়া, পাঠান সুন্নি। উভয় শ্রেণীর লোকই দরিদ্র কিন্তু তা বলে কিছুই আসে-যায় না। মোগলের মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনা পাঠানরা কখনই বরদাস্ত করত না। মোগল মিশ্রজাত, আর পাঠান আর্য এবং সম্মানিত। মোগল কৃষক, পাঠান ব্যবসায়ী। মোগল রাজত্ব করেছিল, পাঠান পরাজিত হয়েছিল। যুগ-যুগান্তের ইতিহাস পাঠান ভুলে নি, মোগল ভুলে গিয়েছিল। গ্রামে মোগলরা এক পাড়াতে বাস করত এবং অন্য পাড়াতে বাস করত পাঠান। মধ্যস্থলে একটি ছোট্ট নালা। এঁকেবেঁকে কোনও মরুভূমিতে মিশে গিয়েছিল। এই নালাটি উপলক্ষ্য করে কত নরহত্যা হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। কত কারবালা গড়ে উঠেছিল এই নালার তীরে তার স্থিরতা ছিল না, কিন্তু মোগল শাসনকর্তা এ-সব পছন্দ করতেন না বলেই কারবালার সৃষ্টি হয় নি।

পাঠানের মেয়েরা পর্দানশীল, মোগলের মেয়েরা স্বাধীন। তারা মাঠে-ঘাটে বেড়ায়। আমিনাও বেড়াত, লোকের সংগে কথা বলত, অনুর্বর জমিতে যে সকল তৃণলতা শুকিয়ে থাকত, কুড়িয়ে নিয়ে আসত। সময়মত আরবী এবং পারসী পদ্য মুখস্থ করত। তারপর একদিন আমিনা আরবী ভাষা শিক্ষা করার জন্য মৌলবী সাহেবের কাছে উপস্থিত হল। বর্ণ-পরিচয় হওয়ার পর মৌলবী সাহেব আমিনাকে আরবী ভাষায় কয়েকটি শব্দ লিখে দিলেন মুখস্থ করার জন্য।

আমিনা আরবী ভাষা শিখবে না জানিয়ে দিয়ে মৌলবীকে বললে "আমি যে সকল অক্ষর শিখেছি তা দিয়ে কি মাতৃ-ভাষার কথা লেখা যায় না?

মৌলবী সাহেব ত অবাক্ হলেন, কেন সে মাতৃ-ভাষা শিখবে, সেই প্রশ্নটাই উঠল বড় হয়ে। অবশেষে মৌলবী সাহেব বললেন "আরবী শব্দ না শিখলে মরবার পর যখন পাপ পুণ্যের বিচার হবে তখন কোন্ ভাষায় আল্লার সংগে কথা বলবে?"

মৌলবীর কথা ধ্রুব সত্য গণ্য করে আমিনা আরবী শিক্ষায় মন সন্নিবেশ করল, কিন্তু মাতৃ-ভাষার প্রতি তার যে দরদ ছিল, সে দরদ একটুও না কমে ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল। আমিনা মেধাবী মেয়ে, কয়েক মাসের মধ্যেই কোরান কণ্ঠস্থ করে ফেলল। কোরান পর্যন্তই মেয়েদের পড়বার অধিকার ছিল। মৌলবী সাহেব মেয়ের প্রতিভা দেখে ভীত হলেন এবং তাড়াতাড়ি তাকে মাদ্রাসা হতে বিদায় দিলেন।

ঘরে বসে আমিনা আরবী অক্ষরের সাহায্যেই মাতৃ-ভাষাতে চিঠি লিখতে আরম্ভ করল। মামুদ ছিল পাশের বাড়িতে দরজি। আমিনা দরজিদের চরিত্র বর্ণনা করে পদ্য লিখল। যে সকল দোষ আরোপ করে যুবক দরজিদের বিরুদ্ধে পদ্য লিখেছিল সেই দোষ হতে তখনও মামুদ বহু দূরে ছিল, কিন্তু দোষটির স্বরূপ সে জানত এবং সেই দোষে যদি দোষী হতে হয় সেজন্যও প্রস্তুত ছিল। আমিনার মত একগুঁয়ে সে ছিল না। মোগল-প্রকৃতি তার ছিল না, ছিল পাঠান-প্রকৃতি। সব কিছু হতে উত্তীর্ণ হওয়াই হল পাঠানদের অভ্যাস। পাঠান সহন-শীল, মোগল বিদ্রোহী। কিছুই সহ্য করতে রাজি নয়।

আমিনার সংগে মুরাদের পত্রালাপ আরম্ভ হল। সময় কেটে কেটে যাচ্ছিল। আমিনার মনে কি এক বিদ্রোহ ভাব জেগে উঠল। সে সামাজিক নিয়ম মানতে পারছিল না। পাড়ার লোক অস্থির হয়ে উঠছিল। বিয়ের পাত্র পাওয়া যাচ্ছিল না, এমন দুর্দান্ত মেয়েকে কে বিয়ে করবে? আমিনার বাবা এক দিন রাগ করে

বলছিলেন, আমিনা যদি সমাজ-দ্রোহী কাজ করে তবে তাকে সুন্নিদের কাছেই বিয়ে দেওয়া হবে। সুন্নিরা সিয়ার কাছে বিধর্মী। বিধর্মীর কাছে বিয়ে হওয়া নরকবাসের তুল্য। আমিনা পিতার কাছ থেকে কঠোর শাস্তির কথা শুনল এবং ভাবল, নরকবাসটা কি রকম দেখাই যাবে এবং সময় ক্ষেপণ না করে দরিদ্র দরজি মামুদের কাছে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব করে। আমিনার প্রস্তাবে মামুদ অবাক হয় এবং চিন্তিত হয়ে বলে, বিয়েত যা' তা' কথা নয়, একটু সময় দাও। উভয় সমাজই আমাদের পরিত্যাগ করবে, সামান্য দরজির কাজ থেকেও বরখাস্ত হব, তখন কি করে আত্মরক্ষা করব, সে কথা চিন্তা করা চাই।

চিন্তায় চিন্তায় কয়েক সপ্তাহ কাটল। অবশেষে ঠিক হল সহরের বাইরে পরিত্যক্ত পুরাতন প্রতিমা মন্দিরে স্থান নিলেই গ্রাম্য সামাজিক অত্যাচার হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। পূর্বকালের অনেক পরিত্যক্ত বাড়ি গ্রামের পাশে ছিল, সেই বাড়িগুলিকে ভূতের বাড়ি বলেই অনেকে নির্দেশ করত। ভূতের বাড়িতে থাকাও কম সাহসের কাজ নয়। তবুও আমিনা নিজের বাড়ি পরিত্যাগ করে ভূতের বাড়িতে মামুদের সংগে থাকতে রাজি হল। আমিনার এবং মামুদের বিয়ে বিনা পুরোহিতেই সমাপ্ত হয় এবং উভয়ে ভূতের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে সুখে থাকতে আরম্ভ করে।

সুখ বেশি দিনের জন্য স্থায়ী হয় না। মামুদ এবং আমিনা যে সামান্য অর্থ নিয়ে বাড়ি হতে বেরিযেছিল সেই অর্থ শেষ হল। ঘরে যে দিন একটি যবও ছিল না, সেদিন খাদ্য অন্বেষণে মামুদ ভূতের বাড়ি হতে বের হবার সময় আমিনাকে বলে গিয়েছিল, "ভয় করোনা আমিনা, শীঘ্রই রুটি নিয়ে ফিরে আসব।"

মামুদ চলে গেলে আমিনা মনে মনে ঈশ্বরের কাছে স্বামীর প্রত্যাবর্তনের জন্যে প্রার্থনা করছিল। কিন্তু আমিনার প্রার্থনা ঈশ্বরের কানে পৌছল না। সাইবেরিয়ার নেকড়ের পাল তুষারপাতের সংগে সংগেই শহরে অত্যাচার শুরু

করেছিল। মেষ, কুকুর, ঘোড়া, গর্দভ, মানুষ যা' সামনে পেল তাই খেয়েই ক্ষুধার নিবৃত্তি করতেছিল।

আমিনার দরজা সাধারণ ওক কাঠের। একটি নেকড়ে লাফ দিয়ে দরজাতে পড়তেই দরজাটি চুরমার হয়ে গেল। আমিনাও নেকড়ের উদরস্থ হল, পড়ে রইল শুধু তার ক'খানা হাড়, আর তারই পাশে পড়ে রইল ছিন্ন কোরান।

ক্রমে তুষারপাত শেষ হল। গাছপালা সজীব ও সতেজ হয়ে উঠল, প্রান্তর প্লাবিত করে সূর্যকিরণ ঝলমল করে উঠল। কিন্তু দেখা গেল, পথে ঘাটে মাঠে ছড়িয়ে আছে মানুষের আর নানা জীবজন্তুর হাড়। সূর্যকিরণে হাড়গুলি চক্‌চক্‌ করছিল; একদিন যে এই হাড়গুলিতে প্রাণের স্পন্দন ছিল, উজ্জ্বল সূর্যকিরণমালা যেন তারই আভাস প্রদান করছিল।

যে সকল লোক অভুক্ত, রোগজীর্ণ, গৃহহীন তারাই ছিল বাইরে। তারাই হয় বরফে জমে মরেছিল নয় নেকড়ের উদরস্থ হয়েছিল। তাদেরই হাড় পড়ে রয়েছিল। এদের স্বর্গবাসের ব্যবস্থার জন্য মোল্লার দল বের হয়েছিল। যাকে যেখানে পেয়েছিল সেখানেই কবর দিয়েছিল। কেউ বললে, মৃত ব্যক্তিরা ছিল কামনার দাস; তাদের কামনা শেষ হয়েছে সেজন্যই এরা মরেছিল।

মুক্ত দরজা দিয়ে আলো এসে আমিনার হাড়ের উপর ঠিক্‌রে পড়ছিল—হাড়গুলি উজ্জ্বল সূর্যকিরণে হাসছিল। মোল্লারা যখন আমিনার ঘরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল তখন আমিনার হাড় উপহাস করে যেন বলছিল, আর তোমাদের সাহায্যের দরকার নেই, আশার নিবৃত্তি এবার হয়েছে। মোল্লার দল ইতস্তত করছিল আমিনাকে কবর দেবে কি না। একজন বলছিল "হাজার হোক ইস্‌লাম ত ছিল, কবর দেওয়াই দরকার।"

ঘরে প্রবেশ করে মোল্লারা দেখলে ছিন্ন কোরানের পাতাগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে, তখন আর তাদের সাহস হল না আমিনাকে কবর দিতে। পবিত্র গ্রন্থের অবমাননা যে করে, তার আবার কবর কি! জাহান্নামই তার উপযুক্ত

ঠাই। কোরানের ছেঁড়া পাতাগুলি মোল্লারা নতজানু হয়ে কুড়িয়ে নিয়ে গেল, আমিনার হাড়গুলি যেভাবে ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল তেমনি ভাবেই পড়ে রইল।

এদিকে জলে সিক্ত মেজের ওপর মামুদ পড়ে রয়েছিল। ঘণ্টা কয়েক পর মামুদের জ্ঞান হয়। আইন অনুযায়ী মামুদ কয়েকখানা রুটি খাবার অধিকার পেয়েছিল। তাকে রুটি দেওয়া হয়েছিল তারপর নিয়ে যাওয়া হয় কাজির কাছে। কাজির বিচারে মাতালের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মামুদকে পুনরায় জেলে পাঠানো হল। মামুদ জেলে ঢুকে আমিনার কথাই চিন্তা করছিল। আমিনা আজ কোথায় এবং সেই বা কোথায় ?

মামুদকে কাজের আদেশ দেওয়া হল। হুজুরের আদেশ মত 'হাঁ হুজুর' বলে কাজে গেল। কতক্ষণ পর জেল দারোগা কি মনে করে মামুদকে পুনরায় ডাকল এবং মামুদকে চুপি চুপি কি বলে ফের কাজে পাঠিয়ে দিল।

সে কাজ করছিল মন দিয়ে, এমন সময় একটি সুন্দর যুবক জিজ্ঞাসা করল, "মামুদ, দারোগা তোকে কেন ডেকে নিয়ে গিয়েছিল রে ?"

মামুদ মাথা নত রেখেই বললে, "তোমাদের ওপর নজর রাখবার জন্য আমার প্রতি আদেশ হয়েছে।"

—তুই কেমন করে নজর রাখবি বলতে পারিস ?

—সে কথাতো দারোগা বলে নি !

এর বেশি আর কথা হল না। কিন্তু মামুদ বুঝলে, এই শিক্ষিত লোকগুলিকে দারোগা ভয় করে। সে জানত সুলতানকে আল্লা পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে আইন বজায় রাখতে। তাঁকে যারা সাহায্য করে তারাও খোদার বিশেষ প্রিয়পাত্র। যারা আল্লার ভক্ত তারা কেন এসব শিক্ষিত লোককে ভয় করে, তার কারণ মামুদ নিজের মনের মাঝেই খুঁজছিল কিন্তু উত্তর পাচ্ছিল না।

মেডিকেল কলেজের আবদ্ধ ছাত্ররা মামুদকে প্রায়ই নানারূপ প্রশ্ন করত, কিন্তু মামুদ কিছুই বলত না। একদিন কিন্তু তাকে মুখ খুলতে হয়েছিল। সে

তার অন্তরের সঞ্চিত সকল কথা শিক্ষিত ছাত্রদের বলেছিল। মামুদের সকল কথা শোনার পর ছাত্রেরা তাকে বুঝিয়ে দেয়, এটা সামাজিক অত্যাচার, এই অত্যাচার হতে রক্ষা পেতে হলে সমাজের আমূল পরিবর্তন করতে হবে। মামুদ কখনও মনে করে নি, সম্মানিত পরিবারের কোন লোক তার প্রতি এত সহানুভূতি দেখাবে। সামান্য সহানুভূতি পেয়েই মামুদ অনেকটা শান্ত হয়েছিল। সম্মানিত লোকের কাছ থেকে সে কেন, তার বংশের কেহই সেরূপ সহানুভূতি পায় নি। বড় লোকের সংগে দরজির ছেলের কি সম্বন্ধ হতে পারে? শুক্রবারে নামাজের সময় মাত্র বড় লোকের সংগে নামাজ পড়তে দেখতে পায়, এর বেশি নয়।

মামুদের মন ক্রমেই ছাত্রদের প্রতি আকৃষ্ট হতেছিল। সে কোরানের বয়েত ভাল করেই জানত, এবার সে অক্ষর পরিচয়ে মন দিল। চতুর লোক নিরক্ষরকে অক্ষর শিক্ষা দিতে সত্বরই সক্ষম হয়। মামুদ অক্ষর শিখে বই পাঠে মন দিল। যে সকল বই সে পড়তেছিল সেগুলি অন্য ধরনের।

দুই মাস কারা জীবন কাটিয়ে মামুদ চলল তার আমিনার সংবাদ নিতে। পায়ে হাঁটা পথে মামুদের সাত দিন লেগেছিল বোখারায় পৌছতে। বোখারা পুনরায় বরফে ঢাকা পড়েছে। পথের দুদিকে জীব-জন্তুর কংকাল পড়ে ছিল। মামুদ আমিনার কথা যখনই ভাবছিল, তখনই অমঙ্গলের চিন্তা তাকে দমিয়ে দিচ্ছিল। অতিকষ্টে যখন সে আমিনার ঘরে পৌছিল, তখন দেখল ঘরের মেঝেতে কংকাল পড়ে আছে। আমিনার পায়ের জুতার একপাটি জুতা একদিকে এবং অন্যপাটি আরেক দিকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। দু'খানা জুতাকেই সে হাতে নিয়ে দেখল তাতে রক্তের চাপ গাঢ় হয়ে রয়েছে। মামুদের কঠিন হাতের মুঠোর চাপে সেই জুতা থেকে জমাট বাঁধা কঠিন রক্তের টুকরোগুলি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মাটিতে ঝরে পড়ল। আমিনার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও গেল। মামুদ বুঝল তার আমিনা আর নেই। সমাজ-পরিত্যক্ত আমিনা ক্ষুধায় মরে নি,

নেকড়ে বাঘে তাকে খেয়েছে। যদি সমাজ তাকে পরিত্যাগ না করত তবে আমিনা মরত না। বেঁচেই থাকত। আমিনার অপমৃত্যু হয়েছে। মামুদ আমিনার হাড়গুলি জড় করে মাটি খুঁড়ে কবর দিল। শহর হতে একখানা কাঠ সংগ্রহ করে তার উপর লিখল, আমিনার মৃত্যু হয়েছে সমাজের অত্যাচারে। তারপর মামুদ সেই কাঠটি আমিনার কবরের উপর স্থাপন করে মুখ ফিরিয়ে রওয়ানা দিল রুশ সীমান্তের দিকে। শরীর তার অত্যন্ত দুর্বল, এবার রুশ সীমান্তে পৌঁছতে পূরো সাতদিন লাগল। সেখানে পৌঁছে আর সে বৃথা সময় নষ্ট করল না, সরাসরি রুশ দেশে প্রবেশ করে, মজুর দলে ভিড়ে পড়ল, কাজে মন দিল। খাদ্যের অভাবে যে শরীর ভেংগে পড়ছিল, সেই শরীর নতুন করে গড়ে তুলল। মামুদের মনে জাগল বোখারার সমাজের দোষ-ত্রুটি, কুসংস্কার সুধরাবার আকাংখা। এক দিকে কাজ এবং কমিউনিজমের পাঠ মামুদ একই সংগে চালাল।

দু' বৎসর রুশ দেশে থেকে মামুদ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল, যতদিন মজুর এবং কৃষকের দাবি পূরণ না হবে, যতদিন বোখারাকে সে সোসিয়েলিস্ট স্টেটে পরিণত করতে না পারবে, ততদিন সে রুশ দেশে যাবে না। তারই মত অক্লান্ত কর্মীদের সহায়তায় মামুদ সমাজ-বিপ্লবের প্রবর্তন করল এবং তাতে কৃতকার্য হয়ে আমিনার মত শত সহস্র রমণীকে হারেম হতে মুক্ত করল। বোখারা দেশ রুশ সভার (সভিয়েটের) অন্তর্ভুক্ত হল।

কিন্তু মামুদ এবং তার সহকর্মীদের মনে শান্তি ছিল না। কাজ করার সংগে সংগে কূটনৈতিক সাম্রাজ্যবাদীদের আসন্ন চক্রান্তের ভয়ও তাদের মনে জাগরূক হচ্ছিল।

এদিকে আর এক ঘটনা ঘটবার সময় এসেছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আনোয়ার পাশাকে বোখারা স্টেট আক্রমণে তৈরী করেছিল। গেল ইস্‌লাম, গেল তুরুক জাত এই বুলি প্রচারিত হচ্ছিল। বোখারা স্টেটের ভেতরে যারা

ইস্‌লাম ছাড়া আর কিছু বুঝত না তারা আনোয়ার পাশাকে সাহায্য করতে আশ্বাস দিয়েছিল। বাহির হতে আনোয়ার পাশা সৈন্য নিয়ে বোখারা স্টেটের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ফল কিন্তু ভাল হয় নি। পেছন দিক থেকে মামুদের মত দেশপ্রেমিক, মানুষ হিতৈষী, মরণ বিজয়ী যুবকেরা আনোয়ার পাশাকে আক্রমণ করেন এবং সেখানেই প্রতিক্রিয়াশীলদের দুষ্কর্মের যবনিকা পাত হয়।

গল্পটি যদিও ছোট এবং এর ঐতিহাসিক নিশ্চয়তা কতটুকু বিবেচ্য বিষয় তবুও এতে আমার মন আকৃষ্ট হয়েছিল। তারপরই সে বললে, "আমরা হিন্দুদের ভয়ানক ভয় করি। হিন্দুরা কখনও কোন বিদ্রোহে যোগ দেয় না। যখনই যে দল জয়ী হয়েছে তারা সেই দলেরই মন যুগিয়ে চলেছে। এদের নিজেদের কোন স্বাধীন সত্তা নেই। এরা নিরীহ রাজভক্ত প্রজা। বর্তমানে "সরকতে আসাম" অর্থাৎ কাবুল বেঙ্কের অর্ধেক অংশ হিন্দুদের, বাকি অর্ধেক রাজ পরিবারের। প্রকৃত পক্ষে রাজপরিবারের সংগে হিন্দুদের অর্থনীতির দিক দিয়ে বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে।

ছেলেটিকে হঠাৎ একজন বয়স্ক যুবক বাধা দিয়ে বললে, এসব বাজে কথা রেখে দাও হে, এখন আমরা আরও গল্প শুনব, শুধু হিন্দু আর রাজপরিবারের কথা শুনে কাজ নেই। দুনিয়ার অনেক কিছু জানবার রয়েছে। আমি বাধা দিয়ে বললাম "একে বলতে দিন, বাধা দিচ্ছেন কেন।" ছেলেটি বললে "আপনাকে কি আর বলব আমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে।"

আরও অনেক কথা হয়েছিল, কিন্তু এখানে তা বাড়িয়ে লাভ নেই।

কাবুলের পথে

পরদিন প্রাতে স্থানীয় হিন্দুদের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমার সংগে একজন পাঠানও ছিলেন। পূর্বেই বলেছি, হিন্দুরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত। আর্য-সমাজীরা বলে "নমস্তে" সনাতনীরা বলে "জয় ধরম কি, জয় গোপালজী কি" শিখরা বলে "সৎ-শ্রী-আকাল"। নানকপন্থীরা সবই বলে। এর মানে হ'ল নানকপন্থীরা সুবিধাবাদী। যে যে-কথায় খুশী হয় তাকে সেই ধর্মেরই প্রচলিত অভিবাদন-শব্দ দ্বারা সন্তুষ্ট করে। আমি এত জটিলতায় না গিয়ে শুধু নমস্কারই বলতাম। কিন্তু এতে একমাত্র আর্যসমাজী ছাড়া আর সবাই আমার ওপর বিরূপ হয়ে উঠল; এমন কি আমাকে কিছুমাত্র ভদ্রতা দেখাতেও তারা কুন্ঠিত হয়ে উঠল। আমি কিন্তু এদের দ্বারে ভিক্ষা করতে যাই নি, গিয়েছিলাম সংবাদ সংগ্রহ করতে। তাই একজনকে বললাম, "তোমাদের কাছে আমি ভিক্ষা চাইতে আসি নি, তোমাদের অবস্থা দেখতে এসেছি মাত্র। আমার সংগে কথা বললে তোমরাই উপকৃত হবে।"

আমার কথা শুনে কএক জন হিন্দু এমন ভাব দেখাতে লাগল যে, তারা যেন হতভম্ভ হয়ে গিয়েছে। আসল কথা হল, এরা বুঝতে পেরেছিল আমি সত্যিই ভিখারি নই, চাইতে আসি নি বরং দিতে এসেছি। নিমেষে তাদের আচরণের পরিবর্তন হল এবং শুরু হল আদর-আপ্যায়ন।

আমি হিন্দুদের বললাম, এখন স্থির হয়ে আমার কথা শোন। তোমাদের যা' বলবার তা এমন ভাষায় বলবে, যে ভাষা আমার সংগের পাঠানও বুঝে। তোমরা আরবী এবং ফারসী কথা বেশি ব্যবহার কর বলেই আমাকে এত কথা বলতে হল। এখন বলতো জীবন কাটছে কেমন? জবাব সেই একই ভারতীয় ধরনের—দিন কেটে যাচ্ছে কোন মতে। এদের এরূপ প্রাণহীন মামুলী কথা

আমার মোটেই ভাল লাগল না। পাঠানের দেশে এসেছি পাঠানের মত শক্তিমান কথা শুনতে চাই। পাঠানরা কখনও বেঁচে আছি মাত্র, কোনরূপে দিন কেটে যাচ্ছে, এসব কথা বলে না। তারা বলে—ভাল আছি, দেহে শক্তি আছে, মন খুশী আছে।

কথার মোড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "হিন্দুদের নাকি গ্রাম হতে সরিয়ে এনে শহরবাসী করা হয়েছে, তার কারণ কিছু বলতে পার?"

একজন বললে, "কারণ তো কিছুই জানি না, তবে এই মাত্র জানি, এটা সরকারী আদেশ এবং তা মেনে চলাই আমাদের ধর্ম। সেজন্যই পৈতৃক ভিটা ছেড়ে চলে এসেছি।"

সংগের পাঠানটি বললে, "এরা কি কারণে শহরবাসী হয়েছে, তা এদের মুখে শুনতে পাবেন না। আমি বলছি শুনুন। যে সকল গ্রামে এখনও হিন্দুর বাস আছে এবং পূর্বে যে সকল গ্রামে হিন্দুর বাস ছিল, তাদের কাছে সবাই টাকা ধার করে। টাকা সুদে আসলে পরিশোধ করতে পারে না। সেজন্য চাষাদের জমি মহাজনদের মালিকানা স্বত্বে পরিণত হয়। হিন্দুদের হাতে জমি চলে গেলে কোন-রূপ ক্ষতি হত না যদি হিন্দুরা নিজে জমি চাষ করত, কিন্তু জমি চাষ করে মুসলমানরা। মুসলমানরা সধারণত একগুঁয়ে এবং জেদী হয়। অপরের জমি চাষ করে অর্ধেকটা ফসল দিয়ে দেওয়া তাদের ধাতে সহ্য হয় না। এদিকে আইনও অমান্য করতে পারে না। সেজন্য দোটানা অবস্থায় অনিচ্ছায় কাজ করে; তারই ফলে আফগানিস্থানে ফসলের অভাব। আফগানিস্থানকে ফসলের অভাব থেকে মুক্ত করার জন্য হিন্দুদের গ্রাম হতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীতে কেউ পুরাপুরি সাধু হয়ে জন্মায় না। প্রত্যেকেরই লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি রিপু অল্পবিস্তর আছে। গ্রামে থাকতে হলে নানারূপ জটিলতার মাঝে জীবন যাপন করতে হয়। অনেক সময় মারামারি কাটাকাটিও হয়ে যায়। আফগানিস্থানের হিন্দুরা গ্রামে বাস করে গ্রামের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে

ভালবাসে কিন্তু গ্রাম্য জীবনের কষ্ট সহ্য করতে রাজি নয়। চিৎকার করে আকাশ ফাটিয়ে দিতে এরা বেশ পটু কিন্তু কেউ যদি একটা চড় মারে তবে সেই চড় ফিরিয়ে দেবার সাহস রাখে না। গ্রামের লোকের খবরদারি করতে পুলিশ সব সময় সক্ষম হয় না। নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হয়। কিন্তু হিন্দুরা এদিকে একেবারে উদাসীন। যাদের আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা নেই, তাদের গ্রামে বাস করা উচিত নয়। আফগান সরকার শান্তিপ্রিয় হিন্দুদের শহরবাসী করে ভালই করেছেন।"

আমার পোশাক হিন্দুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মাথায় শোলার হেট্, গায়ে কোট এবং পরনে ব্রিচেজ্। পাক্কা কাফেরি ধরণের পোশাক। এরূপ পোশাক সাধারণত হিন্দুরা ব্যবহার করতে সাহস করে না। তাদের ধারণা, এরূপ পোশাক পরলে ইউরোপীয় সভ্যতা-বিরোধী পাঠানগণ তাদের হত্যা করবে। সেজন্যই একজন জিজ্ঞাসা করেছিল আমার প্রাণের মায়া আছে কি না? আমার প্রাণের মায়া তথনও ছিল এখনও আছে, তা বলে সকল কাজেই কসাইখানার জীব হতে আমি রাজি ছিলাম না। আমি ওদের বলতে বাধ্য হলাম, তোমরা যে ভাবে থাক সে ভাবে আমি জীবন ধারণ করতে রাজি নই। আমার পোশাক আমার ইচ্ছামত হবে, কেউ যদি প্রতিবাদ করে তবে শক্তি অনুযায়ী সমুচিত প্রত্যুত্তর দেবে।

সংগের পাঠান ছেলেটির কাছে আরও শুনলাম, এরা একে অন্যে যখন ঝগড়া করে তখন মারামারির পরিবর্তে পরস্পরের কাপড়ই ছেঁড়ে। একজনের কাপড় যখন অন্যজন ছিঁড়তে আরম্ভ করে তখন চিৎকার করে হট্টগোল বাধিয়ে দেয়। পাঠানরা কথনও এরূপ দাংগা মেটাতে যায় না। দূর থেকে দেখে আর হাসে।

স্থানীয় হিন্দুদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে সেদিনটি বিশ্রাম করলাম এবং পরদিন ফের পথে বেরিয়ে পড়লাম। এখান হতে কাবুলে দুটি পথ গিয়েছে। একটি পথ চারবাগ এবং বেহুধ হয়ে সোজা এক নম্বর কাবুলে গিয়েছে। আমার সেদিকে

যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু লোকমুখে শুনলাম, এই পথে জলের বড়ই অভাব, যদিও কাবুল নদী ঐ পথেই বয়ে এসেছে। পাঠানদের কথা বিশ্বাস করতে হয় ; কারণ, তারা না জেনে কোন কথা বলে না। দ্বিতীয় পথ নিমলা এবং দুই নম্বর কাবুল হয়ে প্রথম নম্বর কাবুলে পৌছেচে। প্রথম নম্বর কাবুল হল আফগানিস্থানের রাজধানী বা পায়তক্ত। দুই নম্বর কাবুল হল কাবুলের কাছেই একটি ছোট গ্রাম। এই গ্রামটির নামমাহাত্ম্য প্রথম নম্বরের কাবুল হতেও বেশি। পূর্বকালে অনেকে আসল কাবুল না যেয়ে নকল কাবুলে তাঁবু খাটাত এবং আসল কাবুল হতে যখন সৈন্য অতর্কিতে আগন্তুক আক্রমণকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত তখন আত্মরক্ষা করতে পারত না। কোনও বৃটিশ জেনারেল নাকি নামের ভুলে দুই নম্বর কাবুলেই নির্বংশ হয়েছিলেন। আকবর হতে আওরংজেব পর্যন্ত মোগল বাদশাদের অনেক সেনানায়ক শুধু নামের গোলমালেই নাকি যুদ্ধ করতে না পেরে আফগানিস্থান হতে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। হতে পারে এসব উপকথা, কিন্তু এই উপকথার মাঝে কিছুটা সত্য আছে বলেই আমার বিশ্বাস। নকল কাবুল অথবা দুই নম্বর কাবুলের কথা যথাস্থানে বলা হবে।

মানচিত্রে জালালাবাদ এবং কাবুলের সঠিক দূরত্ব ঠিক করা বড়ই কঠিন। তাই অনির্দিষ্ট দূরত্বের জন্য তৈরি হয়েই পথে বের হতে হল। এদিকের পথ পর্বতসংকুল। মোটরকারের পক্ষে বেশ উপযোগী বলতেই হবে, কিন্তু বাইসাই-কেলের পক্ষে উপযোগী মোটেই নয়। পথের উপর ছোট-বড় পাথর ছড়ানো রয়েছে। যখনই সাইকেলের চাকা এরূপ পাথরের উপর গিয়ে পড়ে তখনই সাইকেল ছিটকিয়ে যায় এবং শরীরে বেশ ঝাঁকুনি লাগে।

এদিকের পথে অনেকগুলি গ্রাম আছে। কোন গ্রামে মানুষের বসবাস আছে আর কোন গ্রামে লোকজন মোটেই নেই। দারিদ্র্যই বোধ হয় এর একমাত্র কারণ। আফগানিস্থান স্বাধীন বটে, কিন্তু এখনও দৈন্যদশা এদের ঘোচে নি ; কেননা, যান্ত্রিক যুগে এরা এখনো পৌছতে পারেনি। যান্ত্রিক যুগে পৌছতে হলে

শুধু স্বাধীনতাই সাহায্য করে না, আর্থিক এবং সামাজিক পরিবর্তনেরও সমূহ দরকার হয়। সে দিক দিয়ে আফগানিস্থান যে ভারতের পেছনে পড়ে আছে, একথা অনস্বীকার্য। রাজা আমান উল্লা সে দিকে মন দিয়েছিলেন মাত্র, কিন্তু এরই মাঝে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে যায়। একটি বিদ্রোহ্ শেষ হবার পর আর একটি, তারপর নাদির খানের হত্যা। এরূপ দ্রুত রাষ্ট্রবিপ্লবে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয় এবং ফলে আসে দুর্ভিক্ষ এবং নানাপ্রকারের ব্যাধি। আফগানিস্থানে দুর্ভিক্ষ এসেছিল কি আসেনি, সে সংবাদ আমি রাখি নি, তবে চোখে দেখেছি এদিকের লোক এখনও ম্রিয়মাণ অবস্থাতেই আছে।

আন্দাজ তিরিশ মাইল পথ চলে একটি ছোট গ্রামে পৌছলাম। গ্রামটি সমতলভূমিতে অবস্থিত। গ্রামের পাশ দিয়ে একটি ছোট জলস্রোত বয়ে চলেছে। তারই স্বচ্ছ জলে হাত-মুখ ধুয়ে গ্রামে প্রবেশ করতে যাচ্ছি এমন সময় কএকটা কুকুর আমাকে আক্রমণ করল। এদের মাঝে বুলডগ একটিও ছিল না। আমি কুকুরগুলিকে ঢিল মেরে যখন তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম, তখন একজন লোক নিকটস্থ একটা ঘর হতে বেরিয়ে এল। লোকটি পাতলা এবং গৌরবর্ণ। ফারসি ভাষায় সে আমার সংগে কথা শুরু করল। ফারসি ভাষায় কথা বলাটা যেন একটা বাহাদুরি, আমি হিন্দুস্থানিতে বললাম, 'ফারসি ভাষায় অভ্যস্ত নই।' তখন লোকটি আমার সংগে হিন্দুস্থানি ভাষাতে কথা বলতে আরম্ভ করল। দেখলাম, সে বেশ হিন্দুস্থানী বলতে পারে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম 'এখানে রাত কাটাবার স্থান কোথাও হবে কি না?' সে তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে যেতে বলল। আমি তার অনুসরণ করে একটি একচালা মেটে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঘরের দরজায় তালা লাগান ছিল। তালা খুলে দিয়ে সে একটা চারপাই দেখিয়ে বললে "এই চারপাই-এর ওপর বসুন, আমি খাবারের এবং বিছানার বন্দোবস্ত করছি।" এই বলেই লোকটি এক দিকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু হঠাৎ কি মনে করে ফিরে এসে বললে "এক চারপাইএর উপর দুইজনে শুতে আপত্তি আছে কি না?" আমি বললাম

"মুসাফির কখনও অন্যলোকের সংগে শোয় না, একথা কি আপনি জানেন না ?" মথা নত করে লোকটি ফের চলে গেল।

একচালা মেটে ঘরটি বেশ বড়। তার এক পাশে একটা বড় চারপাই পড়ে ছিল এবং তাতে বিছানাও পাতা ছিল। পাঞ্জাবী ধরণের চারপাইএর ওপর মোটা লেপ-তোশক পাতা দেখে ইচ্ছা হল একটু গড়িয়ে নিই, কিন্তু সে লোভ সংবরণ করতে হল, অপরের বিছানায় বিনা অনুমতিতে শোয়া নেহাত অন্যায় হবে ভেবে। আমি খালি চারপাইটার ওপরই বসে রইলাম।

কতক্ষণ পর লোকটি আরও কএকজন লোককে সংগে করে ফিরে এল। তন্মধ্যে কেউ কেউ আমার সংগে খাঁটি বাংলা ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলে বেশ আনন্দ পাচ্ছিলেন বলেই মনে হল। আমাদের কথা যাঁদের বোধগম্য হচ্ছিল না, তাঁরা আমাদের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। বাংলা ভাষায় আলাপকারীরা প্রত্যেকেই কলিকাতার খুঁটিনাটি বিষয়গুলি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে ছিলেন। এদের বাংলা ভাষা শিক্ষা কারবার উপলক্ষে কলিকাতা আসার ফলেই হয়েছিল। রাত্রে খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত হল কিন্তু কলিকাতা ফেরত পাঠানদের চিন্তিত হতে দেখে বললান "এটা কলিকাতাও নয়, ইণ্ডিয়াও নয়, এখানে আমি আপনাদেরই বাড়িতে খাব। অবশ্য কথাটা বলতে বেশ লজ্জাই হয়েছিল। একজন পাঠান বললেন "আপনি ঢাক্ বাংগালের লোক, জাদু নিশ্চয়ই জানেন।" এখানে "জাদু" মানে মন্ত্রশক্তি। আমি মন্ত্রশক্তিতে অবিশ্বাস করি জানালাম। তখন সে বললে, "তবেতো আপনি নিশ্চয়ই বাহাদুর বাংগালী হবেন। বাহাদুর বাংগালী মানে, যাদের বৃটিশ সরকার টেরারিস্ট নাম দিয়েছে।" কথাটার জবাব না দিয়ে এক কোণে চুপ করে উপবিষ্ট একটি পাঠানকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনিও বোধ হয় বাংলা জানেন ?"

—নিশ্চয়ই জানি মহাশয়, আমি সদিয়া পর্যন্ত বেড়িয়ে এসেছি। আপনি দয়া করে আমার বাড়িতে আসবেন কি ?

আমি বললাম "আমার কোন আপত্তি নেই, তবে যে ভদ্রলোক আমাকে প্রথম ডেকে এনেছেন তাঁর অনুমতি চাই।"

সেই লোকটি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে আমাকে যাবার অনুমতি দিল। আমি তৎক্ষণাৎ আলিজানের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলাম।

আলিজান এখানকার বর্ধিষ্ণু লোক, তাঁর অনেকগুলি ঘোড়া, খচ্চর ও উট আছে, চাষের জমি আছে, পরিবারে অনেকগুলি লোক আছে। তাঁর অনেকগুলি ছেলে মেয়ে। মেয়ে হওয়াটা পাঠানদের পক্ষে সৌভাগ্য। তিনটি মেয়ের পিতার সম্মানের অবধি নেই। আলিজানের বাড়ি বেশ বড়। সামনের ঘরে বসার পর আলিজান বললেন "আপনি নিশ্চয়ই পাঠানদের নিয়মকানুন জানেন? আপনাকে বাইরে গিয়ে শৌচ করতে হবে, স্নানের কোন ব্যবস্থা নেই, তবে হাতমুখ ধোবার জন্য গরম জল পাবেন। এখন বলুন কি খাবেন?" আমি বললাম, "যা আপনারা খান তাই খাব।" আলিজান তৎক্ষণাৎ চা বিস্কুট চিনি-মিশানো নারিকেল এবং অন্যান্য শুকনো ফল এনে হাজির করলেন। আমার আগমন উপলক্ষে আলিজানের বাড়িতে আজ গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি সবাই আহার করবেন।

আমাদের চা খাওয়া হচ্ছিল এমন সময় আলিজান তাঁর ভাইকে একটি দুম্বা কাটবার জন্য পাঠালেন, আমি সে কথাটা বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলাম। দুম্বা সাধারণত বাড়িতে কাটা হয় না। কোন অতিথি থাকলে হত্যা কাজটি আরও গোপনে করা হয়, যাতে অতিথি মোটেই টের না পান। এটা হল পাঠানদের প্রথা এবং তাদের সভ্যতার অংগ। আমাদের দেশে হিন্দুরা পাঁঠা বলি দেয় সকলকে দেখিয়ে, মুসলমানরা ছাগল কাটে উঠানের ঠিক মধ্যস্থলে। এ বিষয়ে আফগানিস্থানের প্রথা যে শ্রেষ্ঠই তাতে কোন সন্দেহ নাই।

আফগান জাত বড়ই গল্পপ্রিয়, কিন্তু নিজের দেশের গল্প তারা বিদেশীকে শুনাতে রাজি নয়, তারা বরং বিদেশের কথাই শুনতে চায়। তাদের দৃষ্টান্ত অনুসারে আমাকেও আমাদের দেশের কথা উহ্য রাখতে হল। গল্প যখন জমে

গেল তখন পোস্ত ভাষায় কথা শুরু হল। আমি যে পোস্ত ভাষা জানি না তাঁরা সে কথা অনেকেই ভুলে গেলেন। আমিও এমনি ভান করেছিলাম যেন তাদের সকল কথাই বুঝতে পেরেছি। গল্প যখন শেষ হয়ে গেল তখন খাবার তৈরী হয়ে গেছে। গল্পের আসরেই খাবার আনা হল। প্রকাণ্ড একটা থালা ভর্তি পোলাও আর একটা থালাতে দুম্বার মাংস। পাঠানেরা মাংসে বেশি মসলা ব্যবহার করে না। অল্প মসলা থাকায় পোলাও এবং মাংসে মানিয়েছিল ভালই।

আমি ছিলাম প্রধান অতিথি, কাজেই খাদ্য হাতে নিয়ে মন্ত্র পড়বার কথা আমারই ছিল। কিন্তু আমি মন্ত্র জানি না বলে অন্য একজন বৃদ্ধ মন্ত্র পাঠ করে খেতে শুরু করার পর অন্যান্য সবাই খেতে আরম্ভ করলেন। ক্ষুধা বেশ ছিল। সেজন্যই বোধ হয় পাঠানদের সংগে তাল রেখে খেতে সক্ষম হয়েছিলাম। আহারান্তে আবার মন্ত্র পাঠ করা হল, তারপর এল চা। চা পান করে সকলকে বললাম "যদি কেহ কিছু মনে না করেন তবে আলিজান খাঁকে সকলের তরফ হতে ধন্যবাদ দেব।" আলিজান খাঁ বলায় অনেকেরই যেন মন বিগড়ে গেল। কিন্তু আমি ছাড়লাম না দু'এক জনের সম্মতির জন্য চারদিকে তাকালাম। অবশেষে যিনি মন্ত্র পড়ছিলেন তিনি সম্মতি দিলেন। আমি সকলের পক্ষ থেকে আলিজান খাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশ্রামার্থ অন্য কামরায় চলে গেলাম। বংশমর্যাদাহীন আলিজান সেদিন হতেই বোধ হয় খাঁ হয়েছিলেন।

রাত্রে আলিজান আমার জন্য পরিচারক নিযুক্ত করলেন, কিন্তু সেই পরিচারককে বিদায় দিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়লাম। সকাল বেলা উঠেই চলে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু আলিজান খাঁ সকালে কিছু খাবারের বন্দোবস্ত করলেন। আলিজান আমার কাছ হতে খাঁ উপাধি পেয়ে এত খুশী হয়েছিলেন যে বিদায়ের বেলা তিনি কতকগুলি আফগানি মুদ্রা পথ-খরচ হিসাবে দিয়েছিলেন।

আলিজান খাঁ-এর গ্রাম পরিত্যাগ করার পর আরম্ভ হল আবার পার্বত্য পথ। রোজ দশ মাইল করে পথ চলা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। কোনদিন পাঁচ

মাইল যাবার পরই সেদিনের মত বিশ্রাম নিতে বাধ্য হতে হ'ত। বিশ্রাম করতাম পথের পাশেই। এতে আরাম বেশ হত। রুটি আমার কাছে মজুত থাকত। পথের পাশে ছোট ছোট ঝরনার জল খেয়ে তৃপ্ত হতাম। কোনরূপ দ্বিধা না করে পথের পাশেই শুয়ে থাকতাম। এরূপ ভাবে কয়েক দিন চলার পর শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল। শরীর দুর্বল হলে মনেও আপনা হতেই ভয়-ভাবনা দেখা দেয়। মন যখন ভয়ে জড়সড় তখন পথিক নানারূপ বিভীষিকা দেখে। সেই বিভীষিকাই একদিন গাল গল্পে পরিণত হয়। আমি সেই বিভীষিকাজাত গল্প হতে রক্ষা পাবার জন্য আফগান জাতের ভালর দিকটাই ভাবতাম। সেজন্যই বোধ হয় আমার মুখ হতে জাতিবিদ্বেষের হলাহল বের হতে পারে নি।

লোকমুখে শুনলাম, অতি কাছেই একটি গ্রাম আছে। প্রতিজ্ঞা করলাম যতদিন শরীর সবল না হয় ততদিন গ্রাম ত্যাগ করে ফের পথে বের হব না। কিন্তু কোথায় গ্রাম, কতদূরে কে জানে? কতদূরে গ্রাম মানচিত্র দেখেও বুঝবার জো নেই। লোকের কথায় যা' শুনি তাতেও আশ্বস্ত হতে পারি না। "চান্দ মাইল আস্ত" কথাটা বাজে কথাই মনে হতে লাগল। চান্দ মাইল আস্ত-এর অর্থ করে নিলাম গ্রামে পৌঁছতে আরও কয়েক মাইল মাত্র বাকি। কিন্তু সকাল বেলাও শুনলাম চান্দ মাইল, বিকালেও তাই—রাত্রি এক প্রহরের পরও সেই একই কথা—চান্দ মাইল আস্ত। ক্রমে এদের কথার উপর অনাস্থা হল, আর পথের সংবাদ কারো কাছ হতে না নিয়ে পথের পাশেই শুয়ে রাত কাটাতে হল।

তন্দ্রা অবস্থায় কারো নাক ডাকতে কখনও শুনি নি। আমি তখনও গভীর নিদ্রায় অভিভূত হই নি, অথচ আমার নাক ডাকছিল। নিজের নাসিকাগর্জন নিজেই শুনছিলাম এবং দৃঢ়সংকল্প করেছিলাম, ঘুম ভাংগলে সর্বপ্রথম কাজ হবে, নোট বইএ এই কথাগুলি লিখে রাখা। লিখেছিলাম বলেই এখানে পুনরাবৃত্তি করতে পারছি ।

সত্যকথা বলতে কোন দোষ নেই। যে দিন হতে আমি স্কুলে যেতে আরম্ভ করেছি সেই শৈশবকাল থেকে কখনও জাগ্রত অবস্থায় মরণের ভয়ে ভীত হই নি। তবে স্বপ্ন দেখে অনেক সময় আমি ভীত হতাম এবং প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেই যেন বাঁচতাম। আজও আমার সেই ভাব এসে পড়েছিল। কত রকমের ভূত প্রেত আমার চারদিকে যেন ঘুরছিল। চোখ খোলা রাখতে চেষ্টা করিছিলাম অথচ চোখ বুজে আসছিল। চেষ্টা করে বসে পড়লাম। তখনও অন্ধকার ছিল। আশে পাশে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার ধারণা ছিল ভরাপেটে শুলে নাকি নানারূপ ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখা যায়। কিন্তু আমার পেট ভরা ছিল না, ছিল খালি পেট। পরে জেনেছিলাম একেবারে খালি পেট থাকলেও নাকি নানারূপ ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখা যায়।

অন্ধকারে অনেক্ষণ বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। নিকটস্থ নির্ঝরিণীতে হাত মুখ ধুয়ে ফের বসলাম। কতক্ষণ পর হঠাৎ অদূরে মোরগের ডাক শুনে বুঝলাম গ্রাম নিকটেই। আমার আর দেরী সইল না, তৎক্ষণাৎ গ্রামের দিকে পূর্ণ উদ্যমে সাইকেল চালালাম। কতক্ষণ যাবার পরই একটা জলভর্তি ছোট নালার ধারে এলাম। নালার ওপারেই একটি সরাই হতে হারিকেন লাম্পের আলো আসছিল। সেই আলোয় নূতন আশা মনকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিল।

সরাইএর দরজা এবং নিকটস্থ কাফিখানার এক দরজা তখনও খোলা ছিল। কাফিখানাতে কএক জন লোক চা খাচ্ছিল। আমাকেও চা দিতে বললাম। গ্রামের মসজিদে যিনি আজান দেন তিনিও চা খাচ্ছিলেন এবং হাতের মালা টপকাচ্ছিলেন। মালা টপকানো এদেশে খুব প্রচলিত। মালা টপকানো সম্বন্ধে এখানে কিছুই বলব না, যদি পারি তবে পরে বলব। আমি কোথা হতে এসেছি, কোথায় যাব এবং কি কাজ করি মোল্লা জিজ্ঞাসা করলেন। সংক্ষেপে আমার

পরিচয় দিলাম। মোল্লা আমার পিঠে হাত রেখে বললেন "বলুন তো কখনও ভূত প্রেত এবং জিন দেখেছেন কি না ?" আমার হাতের ঘড়িটা বাতির কাছে নিয়ে দেখলাম তখন প্রায় পাঁচটা বেজেছে। বললাম এই দেখুন রাত আর মাত্র দেড় ঘণ্টা আছে, আজ একাকী বাইরে ছিলাম, ভূত প্রেত তো দেখিনি। লোকটি আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না। এদিকে চায়ের পেয়ালাগুলি এক এক নিশ্বাসে উজাড় করছিলাম। বয় চায়ের পেয়ালা ভর্তি করে দিচ্ছিল। শেষটায় মোল্লাকে বললাম "ভূত প্রেত আমাদের পেটে থাকে ; এর মানে হ'ল যখনই আমাদের পেট গরম হয় তখনই নানারূপ স্বপ্ন দেখি। গত চার বৎসর যাবত দেশ বিদেশে ঘুরছি, অনেক বনে জংগলে রাত কাটিয়েছি, কোথাও কোনদিন ভূত প্রেত দেখিনি।"

মোল্লা জিজ্ঞাসা করলেন, ফিরিঙ্গী দাওয়াই বিশ্বাস করেন ?

বললাম "নিশ্চই"।

মোল্লা একটা হাই তুলে বললেন "এটা. কাফেরির লক্ষণ"।

পাশের একজন লোক প্রতিবাদ করে বললে, ফিরিঙ্গী দাওয়াই না হলে আমাদের চলে না। হেকিমি দাওয়াই তো কোন কাজেই লাগে না। ইংলিশদের সংগে যখন লড়াই হয়েছিল, তখন ফিরিঙ্গী দাওয়াই না পেলে অনেক আহত সেপাই মরে যেত।

মোল্লা ত একদম চুপ। তাঁর দুরবস্থা দেখে আমার দুঃখ হল, তাঁকে বুঝিয়ে বললাম "না বুঝে কোন কিছুর বিরুদ্ধে চট্‌পট্ মত প্রকাশ করা আপনাদের মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে অন্যায়। আপনারা ত চান দুনিয়ার ভাল, বিলাতী ঔষধ ব্যবহারে ক্ষতি কি ?"

মোল্লার একটু শান্তি হল। তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে বিশ্রাম করার জন্য অনুরোধ করলেন, আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর অনুসরণ করলাম।

মোল্লার বাড়ী মসজিদ হতে সামান্য দূরে। বাড়ীতে পৌঁছে তিনি অন্দরে প্রবেশ করলেন আর আমি বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে ছিলাম। বাড়ীটি ছোটখাট দুর্গবিশেষ। এই ধরনের বাড়ীঘর তৈরী হয় যেখানে বন্য জীবের প্রচুর অত্যাচার। আফগানিস্থানের উত্তর দিকটাতে নেকড়ে বাঘ ভয়ানক অত্যাচার করে। প্রত্যেক পাঠানের বন্দুক পিস্তল এমন কি মেশিনগান পর্যন্ত থাকে, তবুও দল বেধে যখন নেকড়ে আক্রমণ করে তখন বন্দুক-কামানে কিছুই হয় না। নেকড়ের নাগালের বাইরে চলে যেতে হয়, নতুবা রক্ষা থাকে না।

পাঠানদের মধ্যে প্রচলিত কথা আছে, যদি বাঁচতে হয় তবে মরণের সময়ও শত্রুকে রুখতে হবে। যদি বাঁচতে হয় তবে নেকড়ে বাঘের মত লড়তে হবে। মরণকে কোন মতেই ভয় করলে চলবে না। "কথাটা যখন শুনেছিলমে তখন মনে হয়েছিল নিজের দেশের কথা। আমাদের প্রাণের মায়া অপরিসীম, আমরা মরতে জানি না, বাঁচতেও জানি না। আমরা আমাদের ভবিষ্যত ঈশ্বরের ওপর ছেড়ে দিই। পাঠানরা আল্লাকে মানে, আল্লার নামে ভয়ও পায়, কিন্তু তা বলে নিজের দেশকে, নিজের মা-বোনকে রক্ষা করার সময় আল্লার ওপর সব ছেড়ে দেয় না। তারা বিপদের সময় "পয়মাল" স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং প্রাণও দেয় বীরের মত। একজন পাঠানকে বলেছিলাম মরণের সংগে পয়মালের উপমা দেওয়াটা উচিত হয় নি। পাঠান তেড়ে বললে" যখন মরতে যাব তখন যদি অন্য ভাব থাকে তবে পরাজয় অনিবার্য। শূকর যখন আক্রমণ করে তখন মরণের ভয় রাখে না। এসব কথা শোভা পায় তাদেরই যারা যে কোন মুহূর্তে মরণকে আমন্ত্রণ করতে পারে।

দাঁড়িয়ে পূর্বস্মৃতি জাগিয়ে তুলছিলাম আর দেখছিলাম মোল্লার বাড়িটা। আধঘন্টার মাঝেই মোল্লা ফিরে এলেন এবং আমাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন। বাড়িতে অনেকগুলি ঘর। সামনের দিকের একটি ঘরে আমরা প্রবেশ করলাম। মোল্লা আমাকে সুসজ্জিত এক বিছানা দেখিয়ে বললেন, এতে

শোবেন এবং অন্যান্য দরকারি কাজ সারতে হলে বাইরে যাবেন। চারপাইএর কাছেই একটি সন্দলও ছিল। সন্দলের কাছে না বসে চারপাইএর ওপর বসলাম এবং লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

বেলা দশটার সময় ঘুম ভাঙল। চট্‌পট্ প্রাতকৃত্য সেরে ঠাণ্ডা জলে হাত মুখ ধুয়ে আবার খাটে এসে বসলাম এবং আরাম করে একটি সিগারেট ধরালাম। ইত্যবসরে মোল্লা কএকজন ছাত্রকে নিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। সবাইকে নমস্কার করলাম। তাঁরা বিনিময়ে "আদাব" করলেন। এখানে স্তারেমশে শব্দের খুব কম ব্যবহারই দেখলাম। ছাত্রদের মাঝে একজন হিন্দুও ছিলেন। তার মাথায় ছিল বোখারার ফেজ। অন্যান্যদের মাথায় ছিল পাগড়ি। ছোট ছোট মাসাদের কাপড়ের পাগড়িগুলি দেখাচ্ছিল বেশ। যে কজন যুবক এসেছিলেন তাদের প্রত্যেকেরই শরীর নিখুঁত এবং নীরোগ। এরূপ নিখুঁত এবং নীরোগ দেহ আফগানিস্থানে কমই দেখা যায়। তাঁরা ছিলেন গম্ভীর এবং স্বল্পভাষী। তাঁদের ললাটে এবং মুখের ওপর চিন্তার রেখা পড়েছিল। চিন্তাশীলের মুখের ভংগিই অনুরূপ। চিন্তারেখাযুক্ত মুখ আমার কাছে প্রিয়। আমি সেই প্রিয়দর্শন মুখগুলি দুচোখ ভরে দেখছিলাম। মোল্লা তাদের প্রত্যেককে আমার সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তাঁর নিজের ছেলেটিও বাদ পড়েনি। তাঁরা প্রত্যেকেই মেডিকেল স্কুলের ছাত্র।

আলাপ পরিচয় হবার পর আমরা সকলেই দুইখানা করে পরোটা এবং চা খেলাম। তারপর কথা আরম্ভ হল। কিন্তু কথা বলতে আমার ভাল লাগছিল না। সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল; সিগারেট না হলে যেন কি একটা অভাব অনুভব হয়। একজন ছাত্র আমার অবস্থাটা বুঝে নিকটস্থ একটা দোকান হতে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দিলেন, আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে ধাতস্থ হলাম।

এখানেও আমিনা এবং মামুদের গল্পের পুনরাবৃত্তি হল। তারপর শুরু হল চীনের ডাকাতদের তথা কমিউনিস্টদের কথা। চীনের কমিউনিস্টরা ডাকাত

বলেই সর্বপ্রথম সুখ্যাতি লাভ করেছিল। আমানউল্লা এবং বাচ্চা-ই-সিক্কার কথা কেউ বললেন না দেখে আমিই তাঁদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম। সকলেই আমান-উল্লার ছবি মন হতে মুছে ফেলেছিল কিন্তু অনেকে এখনও বাচ্চা-ই-সিক্কার কথা ভূলে নি।

মোল্লার বাড়ীতে চারদিন কাটিয়ে তাঁর পুত্র ইয়াকুবকে সংগে নিয়ে চললাম কাবুলের দিকে। ইয়াকুবের বয়স মাত্র একুশ। এরই মাঝে সে ফারসি এবং হিন্দুস্থানি ভাষা বেশ আয়ত্ত করে ফেলেছিল। পূর্বেই বলেছি এরা সবাই নিখুঁত এবং সবল যুবক। এই যুবককে সংগে নেবার কারণ একটু পরই বলব।

পঞ্চমদিন সকাল বেলা আমরা গ্রাম ছেড়ে বড় পথে এলাম। আমি আগে আর ইয়াকুব পেছনে। প্রায় মাইল দশেক চলার পর ইয়াকুব বললে সে একটু বিশ্রাম করবে। আমি তাতে রাজি হলাম এবং উভয়ে একটা পাথরের আড়ালে বসলাম। আমাদের সংগে রুটি এবং মুরগির তরকারি ছিল। উভয়ে বেশ করে খেয়ে নিলাম এবং তারপর কথা শুরু হল। ইয়াকুব বললে "বোখারার দৃষ্টান্ত তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, সে আফগানিস্থানকে বোখরায় পরিণত করবেই।"

আমি নির্বাক হয়ে শুধু তার কথা শুনছিলাম। সে ফের বলতে লাগল "পথেই আমি বুঝতে পারব মেডিকেল ছাত্রেরা কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করছে।" আমি তাকে বললাম "যখন তোমার উপর অত্যাচার উৎপীড়ন চলবে তখন আমি চুপ করে থাকব না, বাধা দেব। তাতে যদি আমার আফগানিস্থান ভ্রমণ না হয়, না হবে, বেলুচিস্থান হয়ে ইরাণ যাব।" পাঠান জাত বড়ই ভাবপ্রবণ, আমার মুখের সামান্য এই কয়টি কথাতেই সে স্তব্ধ, গম্ভীর হয়ে গেল। আমরা আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে পুনরায় অগ্রসর হলাম।

একটু যাবার পর পাশেই একটি কবর পড়ল। ইয়াকুব সাইকেল থেকে নেমে কবরে গিয়ে প্রার্থনা করে বললে, "কি প্রার্থনা করেছি জানেন" ?

—বল কি বলেছ। বলেই তার মুখের দিকে তাকালাম।

সে মাথা নত করে বললে, শেষের দিনে যেন ঈশ্বর এই পবিত্র ইসলাম আত্মার সদ্গতি করেন।

—বুঝেছি হে, আমি এখানে যদি মরি তবে আমার আত্মার জন্য সেরূপ প্রার্থনা করবে না, যেহেতু আমি ইসলাম ধর্মের লোক নই।

সে একটু হেসে বললে "আমাদের দেশের লোকের ধারণা কিরূপ তা বুঝাবার জন্যই এরূপ বললাম, এসব কথা মনে রাখবেন না। এগিয়ে চলুন, আজ আমাদের একটা ছোট গ্রামে পৌছানার কথা আছে, সেখানে আপনি যেমন লেকচার দেবেন আমিও তেনিনি লেকচার দেব।"

পাহাড়ের গায়ে গ্রাম। গ্রামটি ছোট হলেও বেশ পরিষ্কার। আমরা কিন্তু একটা আবর্জনাপূর্ণ ঘরে প্রবেশ করলাম, যেন আমাদের দেশের একটা গোয়াল ঘর। ঘরে প্রবেশ করা মাত্র দুর্গন্ধ অনুভব করলাম। ঘরটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার। এরূপ ঘরে বসতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। শুধু ইয়াকুবের অনুরোধেই বসতে হয়েছিল। আমরা ঘরে প্রবেশ করামাত্রই তিনটি প্রৌঢ় লোক ইয়াকুবকে ঘিরে দাঁড়াল। ইয়াকুব প্রত্যেকের সংগে করমর্দন করল, আলিংগন করল না। আমিও করমর্দন করলাম। একটি লোক ঘরে আগুন জ্বালল এবং আমাদের বসবার জন্য কারপেট দেখিয়ে দিল। আমরা তাতেই বসলাম। অল্প সময়েই চা তৈরি হল। আমাদের চা খেতে দিয়ে তিনটি লোকই কিসের জন্য গ্রামে গেল সেটা কিছুই বুঝলাম না।

অনেকক্ষণ কথা বলে বুঝলাম, প্রগতিশীল যুবকগণ করমর্দনই করে, অলিংগন করে না এবং যদি কেউ পূর্বপ্রথাকে সম্মান দেখাতে বলে তবে তারা বিনা তর্কে এমনই একটা ভংগি করে যে কেউ আর তাদের আলিংগনের জন্য অনুরোধ করবে না।

আফগান জাত নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত তা পূর্বেই বলেছি। ইয়াকুব সেই শ্রেণীগুলি ডিংগিয়ে আর এক স্তরে উঠেছিল। তার নাকে নভিক ছাপ রয়েছে,

চোখ কটা, চুল পিংগলবর্ণ। তা বলে সে কখনও আর্য বলে নিজের পরিচয় দেয় নি। সাধারণত আফগানিস্থানে দ্রাবিড়, আর্য, মোংগল এবং সিমেটিক্‌দের মাঝে বিবাহ চলে কিন্তু মোংগলরা এই তিন শ্রেণীর লোকদের সংগে বৈবাহিক-সম্পর্ক স্থাপন করে না কারণ মোংগলরা প্রায়ই শিয়া। শিয়া এবং স্থন্নিতে কেন বিয়ে হয় না সে কথা আমি জানতে চেষ্টা করি নি। যে তিনটি লোক গ্রামে চলে গিয়েছিল তারা মোংগল নয়, যে লোকটি চা এবং রান্নার বন্দোবস্ত করছিল সে মোংগল। সে আলির ভক্ত, মোহম্মদের নাম সে নেয় না। কিন্তু এই দুর্গন্ধযুক্ত ঘরে মোংগল এবং অমোংগলের একত্র সমাবেশ দেখে সন্দেহ হল, এরা নিশ্চয়ই কোন রাজনৈতিক দলের লোক। ইয়াকুবকে এ সম্বন্ধে কিছুই বললাম না। বালিশে হাত দুটা ছড়িয়ে দিয়ে ওপর দিকে চেয়ে রইলাম। লোক তিন জন ফিরে আসার পর রান্নার বন্দোবস্ত হল। পাঠানদের পাক-প্রণালী আমাদের মত নয়। একদম সদাসিদে। দোকানের নান, চাপাতি আর নুন মাখানো টুকরা মাংস। মাংসগুলিকে একটা লোহার শিকে গেঁথে নেওয়া হল। চায়ের সকল বন্দোবস্তই ছিল। আমাদের খাওয়া এবং হাতমুখ ধুয়ে বসতে আধ ঘণ্টার বেশি লাগল না।

পাঠানরা বড়ই গল্পপ্রিয় একথা আগেই বলেছি। গল্পের দিকে আমি ঝুকিনি ; তারাই গল্প আরম্ভ করেছিল। আমি শ্রোতা। ফারসি ভাষায় কথা বলছিল, কারণ মোংগল লোকটি পারতপক্ষে পোস্ত ভাষায় কথা বলত না। এদের কথায় ইনক্লাব শব্দটি বার বার উচ্চারিত হতে শুনে ভীত হয়ে পড়েছিলাম কারণ লাহোর একটি সংবাদপত্রের নাম ছিল ইন্‌ক্লাব। সেই সংবাদপত্রের কাজই ছিল সাম্প্রদায়িক বিভেদ জাগিয়ে রাখা। ভাবলাম হয়তো এরাও আমাকে নিয়ে একটা বিরোধের স্থষ্টি করছে। আমি তখনও ইন্‌ক্লাব শব্দের অর্থ কি জানতাম না। ইয়াকুবকে বললাম, আমার ধর্ম নিয়ে যদি ওরা কোন প্রশ্ন উঠিয়ে থাকে তবে বলে দাও আমি তোমার সংগ এখনই পরিত্যাগ করে বাইরে গিয়ে শোব, আমার সে

অভ্যাস আছে। ইয়াকুব আমার কথা শুনে আশমান হতে পড়ল, সে জিজ্ঞাসা করলে, "এই কথাটার মানে কি বলুন ত?" আমি বললাম "এরা বার বার ইন্‌ক্লাব বলছে। লাহোরে একটি সাপ্তাহিক কাগজ আছে যার নাম ইন্‌ক্লাব; সেই কাগজের কাজই হল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগিয়ে রাখা। আমার ভয় হচ্ছে এখানেও সেই সাম্প্রদায়িব বিদ্বেষ প্রবেশ করেছে।"

ইয়াকুব বললে "ইন্‌ক্লাব মানে কি জানেন না?"

আমি বললাম, ইন্‌ক্লাব মানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো বলেই মনে হয়।

ইয়াকুব হেসে বললে "আপনাদের দেশে ইন্‌ক্লাব মানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হতে পারে, কিন্তু এখানে তার অর্থ বিদ্রোহ। যাকগে চুপ করে থাকুন, এ কথাটি কখনও মুখে আনবেন না।"

ভাবলাম স্থানভেদে শব্দেরও বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। লাহোরে ইন্‌ক্লাব সাপ্তাহিক আরবী অক্ষরে ছাপা হ'ত, অতএব তাতে বিদ্রোহ প্রচার করা হ'ত কি সাম্প্রদায়িক বিরোধ জাগিয়ে রাখা হ'ত তা আমি ঠিক করে বলতে পারি না। তবে আমাকে অনেকেই বলেছিল এই কাগজখানা আর্যসমাজীদের উল্টো কথাই বলে।

ইয়াকুব এবং অপর চারজন লোক অনেকক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথা বলে আমার মুখের দিকে তাকাল এবং খুব চিন্তা করে জিজ্ঞাসা করলে "তুম্ কাবুল যাওগে?"

আমি বললাম "সেরূপই ইচ্ছা"।

মোংগল লোকটি বললে "হুসিয়ার হো কে বাত করো, ইন্‌ক্লাব কা মতলব মালুম নেই আউর মুসাফির বল্‌কে জাহির করতা হ্যায়, সরম নেই হোতা?"

মনে মনে বললাম "জাহান্নামে যাক তোমার ইন্‌ক্লাব, যেরূপ ঠাণ্ডা পড়েছে তাতে প্রাণ বাঁচানই দায়। মুখে বললাম, একটু আগুন ধরাও না মোল্লা সাহেব, আমার শরীর যে কাঁপছে। আমার কথা শুনে সবাই এক সংগে হেসে উঠল।

দুর্গন্ধযুক্ত স্থানটাতে কোন মতে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে সকলের সংগে করমর্দন করে বিদায় নিলাম। ইয়াকুব পথে এসে মুখ খুললে, আমি মুখ বন্ধ

করলাম। আমি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে চললাম আর ইয়াকুব বকে যাচ্ছিল। শেষটায় সে বললে "পাহাড়টার গায়ে আপনি কি দেখছেন ?"

—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখছি হে ?

ইয়াকুব প্রাকৃতিক দৃশ্য পছন্দ করত না। সে বললে "এই পাহাড়ে অনেক ধাতব পদার্থ আছে, যদি জিয়লজিষ্ট এখানে অনুসন্ধান করেন তবে হয়ত স্বর্ণ খনিও পেতে পারেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এখনও আমাদের দেশে সেরূপ বন্দোবস্ত হয় নি।"

দ্বিপ্রহরে আমরা একটি ফেরিওয়ালাকে পথে পেলাম, সে গ্রামান্তরে যাচ্ছিল। সে রুটি ফেরী করে বিক্রি করছিল। তার কাছ থেকে রুটি কিনে দ্বিপ্রহরের ভোজন শেষ করে নিলাম। এরূপ ফেরিওয়ালা আর কোথাও দেখি নি। এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে ফেরি করে জিনিস বিক্রি করতে দেখা যায় না এবং সম্ভবও নয়। কারণ গ্রামগুলি অনেক দূরে দূরে। তবে এই ফেরিওয়ালা কে ? পরে জেনেছিলাম এই লোকটি ফেরিওয়ালা নয়, ইয়াকুবেরই একটি আত্মীয়—পূর্বে সংবাদ পেয়ে আমাদের জন্য খাদ্য নিয়ে এনেছিল। তবে সে রুটির দাম নিল বেশ ? বোধ হয় আমি যাতে চিনতে না পারি এইই ছিল তার উদ্দেশ্য। খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম করবার জন্য আমরা একটি স্থান বেছে নিলাম।

স্থানটি পরিষ্কার এবং পাহাড়ের আড়ালে। সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ, তারপরই আর একটা পর্বত। অন্য একটা পর্বতের উপর কালো ছায়া বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। ভাবপ্রবণতায় অভিভূত হয়ে পড়লে বাস্তবকে ভুলে যেতে হয়। আসলে পাহাড়-পর্বত পাথরের ঢিবি বৈত নয়। ইয়াকুব কিন্তু এরই মাঝে শুয়ে পড়েছিল। এরূপ পরিশ্রম সে কখনও করেনি তাই ঘুম তার চোখে লেগেই ছিল। আমরা আরও দুটো দিন বাইরে কাটিয়ে কাবুলের সন্নিকটে এলাম। আমার আনন্দ হচ্ছিল কাবুল দেখব বলে, আর ইয়াকুবের মুখ গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠছিল কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে বলে। ইয়াকুবের মুখ এবার সত্যিই মলিন দেখাচ্ছিল।

তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম আর একটু এগিয়ে গেলেই ঘাঁটি পাওয়া যাবে। সেখানে তাকে বলতে হবে কেন সে কাবুল যাচ্ছে। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে সে পাচ্ছিল না। তাকে অভয় দিয়ে বললাম "তুমি বলবে, কাফেরটাকে অনুসরণ করে চলেছ এবং দেখছ সে এসলামের কোনও ক্ষতি করছে কি না।" যুবক যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কতক্ষণ যাবার পরই আমরা একটা ঘাঁটিতে পৌছলাম। ঘাঁটিতে কোন সেপাই ছিলনা, মুফতি পোশাক পরে একজন অফিসার বসেছিলেন। এসেই পাসপোর্টখানা তাঁর হাতে দেবার পর ইংগিতে তিনি আমাকে ঘাঁটি পার হবার আদেশ দিলেন। হন্ হন্ করে চলে গিয়ে একটু দূরে ইয়াকুবের অপেক্ষায় দাঁড়ালাম। এদিকে ইয়াকুব এসেই চোখ মুখ লাল করে কাস্টম অফিসারকে কি বললে এবং কাস্টম পার হয়ে চলে এল।

আমি তখনও দাঁড়িয়েছিলাম। সে আমাকে তদবস্থায় রেখেই এগিয়ে চলে গেল, যেন আমার সংগে তার পরিচয় নেই। কতক্ষণ যাবার পর উভয়ে মিলিত হলাম। ইয়াকুব বললে "আমার উপদেশে নাকি বেশ কাজ হয়েছে।"

আমরা সে দিন আর বেশি দূর না গিয়ে একটি সাবেকি ধরণের গৃহস্থের বাড়িতে অতিথি হলাম। গৃহস্থও আমাদের মামুলি ভাবেই গ্রহণ করলেন। রাত্রে খাবার জন্য আমরা প্রত্যেকে মাত্র দু'খানা করে রুটি খেতে পেয়েছিলাম। দারিদ্র গৃহস্থ একটু তরকারি দিতেও সক্ষম হন নি। আমি বারবার ইয়াকুবকে ইংগিতে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম, গৃহস্থ যেন কোন মতেই আমাদের অন্তরংগ ভাব বুঝতে না পারেন। ঘুমাবার সময়ও দু'জন দুদিকে ঘুমালাম, মাঝে শুল গৃহস্বামী। গৃহস্বামী আমাকে যা খেতে দিয়েছিলেন ইয়াকুব তার একটুও বেশি পায় নি। ইয়াকুব ইসলাম ধর্মের রক্ষকরূপে ঘরে প্রবেশ করেছিল এবং আমার নামে নানা রকম বদনাম করেছিল। কিন্তু গৃহস্থ উভয়কেই মুসাফির ভেবে সমান ব্যবহারই করেছিলেন।

প্রথম ঘাঁটি-টি হ'ল পূর্বকথিত দু নম্বর কাবুল। এ স্থানটার সম্বন্ধেই নানারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। এই স্থানটি সমতল এবং জলেরও বেশ সুবিধা আছে। শোনা যায় লড়াইএর সময় জল বিষাক্ত করে দেওয়া হ'ত ; কিন্তু এখানে সে বন্দোবস্ত ছিল না। এজন্যই বোধহয় বৈদেশিক আক্রমণকারীরা পূর্বে এসব স্থানেই তাঁবু ফেলত। কিন্তু তাদের চোখের সামনে পর্বতমালাতে পাঠান সৈন্য লুকিয়ে থাকতে পারে, সেটাও তাদের জানা উচিত ছিল। হরিসিং লিলুয়া এবং রাজপুত সৈন্য যখন কাবুল আক্রমণ করেছিলেন তখন তাঁরা এখানে তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করেন নি। প্রত্যেকেই এই স্থানটিকে বাঁয়ে রেখে আরও উজানে গিয়ে, পেছন দিক হতে আসল কাবুল আক্রমণ করেছিলেন। কাবুলে যত আক্রমণকারী এসেছিলেন, তন্মধ্যে কারো নাম ইতিহাস ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু হরিসিং লিলুয়ার নাম আজও শিশুদের ঘুম পাড়ানি গানের সংগে জড়িয়ে রয়েছে। হরিসিং লিলুয়া কখনও সমতল ভূমিতে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে নিজেকে বিপন্ন করেন নি। তিনি নতুন নতুন দুর্গ গঠন করে তাতেই শিখ সেপাইদের থাকবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। আজও সেই দুর্গমালা বর্তমান। বৃটিশও হরিসিং লিলুয়ার অনুকরণ করে কাবুলের কাছেই একটা দুর্গ তৈরি করেছিলেন, আজ সেই দুর্গ খালি পড়ে আছে, একখানা ঘরও তাতে নেই, শুধু চারদিকে দেওয়াল দেখতে পাওয়া যায়। আমি সেই পুরাতন দুর্গ দেখতে যাই নি। দুর্গ দুর্গ-ই, শাসিত এবং শাসকের মধ্যে একটি পর্দা মাত্র। যখনই শাসকের শক্তি ক্ষয় হয় তখন দুর্গের দেওয়ালই শুধু থাকে, ঘর সেখানে থাকে না।

সকালে উঠেই আবার আমরা পথে এলাম। পথ দুর্গম নয় তবে উল্টা বাতাস বইছিল। উল্টা বাতাসে চলা ভয়ানক কষ্টকর। সেজন্য আমরা একটা ঘরের আড়ালে শুয়ে পড়লাম। ইয়াকুব আমার ঘুমে বাধা দেয় নি। সে আমার সংগে সংগে যেতে পছন্দ করছিল এবং কাবুলে যত দেরি করে পৌঁছতে পারি তারই

উপায় খুঁজছিল। প্রায় তিনটার সময় যখন ঘুম ভাঙল তখন ইয়াকুব বললে, আজ এখানেই থাকা যাক, রুটি নিয়ে আসছি বলেই ইয়াকুব চলে গেল।

ইয়াকুব কখনও ভারতবর্ষে আসে নি, আসবার ইচ্ছাও ছিল না। সে ভারতবর্ষ না দেখে দেখতে চাইছিল রুশ দেশ এবং উত্তর চীন। চীনের সংবাদ পাবার তরে ভারি আগ্রহ। কথায় কথায় বললাম "কুসংস্কারের দিক দিয়ে এবং খাদ্যের দিক দিয়ে ভারতবর্ষের সংগে পাঠানদের বেশ মিল রয়েছে। তন্ত্রমন্ত্র, ভূতপ্রেত পাঠানদের ঘাড়ে যেমন চেপে বসেছে, ভারতবাসীর ঘাড়েও তেমনি চেপে আছে। পাঁঠানরা ভাল রুটি তরকারি অথবা ডাল ভাতই খেয়ে থাকে, ভারতবাসীরাও তাই খায়। পৃথিবীর অনেক স্থানে গিয়েছি, সর্বত্র দেখেছি ভারতবাসী এবং পাঠান একত্রে বসবাস করে। আমেরিকায় পাঠান নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয় এবং দাবি করে তারাই আসল এবং পবিত্র হিন্দু। বাঙালী মুসলমানকে পাঠানরা কোনদিনই হিন্দু বলে স্বীকার করত না, এখনও করে না। সেজন্য ডিট্রয় শহরে পাঠান এবং পাঞ্জাবী মুসলমান মিলে গড়েছে হিন্দু সভা আর অন্যান্য ভারতবাসী সবাই মিলে গড়েছে ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন্। পাঠানরা হেসে আমেরিকানদের বলে, আমাদের দেশেও ইণ্ডিয়ান আছে, ঐ দেখো তাদের এসোসিয়েসন। ডিট্রয় যাবার পর যখন আমি ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন উঠিয়ে দিয়ে হিন্দু এসোসিয়েসন নাম দেবার প্রস্তাব করি তখন অনেকেই আমার প্রতি রাগ করেছিল। তার একমাত্র কারণ পাঠানদের সংগে বাংগালী মুসলমানদের মনের মিল ছিল না। অথচ প্রত্যেকেই নিজেদের খাঁটি হিন্দু বলে প্রমান করতে চাইত।

আমরা যে স্থানে বিশ্রাম করছিলাম তার একদিকে একটি পুরাতন ঘর আর অন্যদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠ খালি।

শীত সমাগত। রাত্রি যখন গভীর তখন একদল পুলিশ আমাদের দিকে আসছিল। পুলিশ দেখেই ইয়াকুব পলায়ন করল, আমি একলা শুয়ে থাকলাম। পুলিশ আমাকে একাকী দেখে সাহসী বলে খুব প্রশংসা করে নিজেদের কাজে গেল।

ইয়াকুব ফিরে এসে বলল "খুব বেঁচে গেছ। পুলিশ যদি তোমাকে আমার সংগে দেখত তবে আর রক্ষা ছিল না, নিশ্চয়ই করাগারে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আবদ্ধ রাখত।"

আফগানিস্থানের জেলে খাদ্যের সুবন্দোবস্ত নাই। এখনও আফগান কারাগার আদিম অবস্থাতেই আছে। অনেক কারাগারে খাদ্য সরবরাহ করা হয় না। বাইরে থেকে কয়েদীকেই খাদ্য যোগাড় করে আনতে হয়। সেজন্য অনেক কয়েদীকে ডাণ্ডা বেড়ি পায়ে পথে ঘাটে দেখা যায়। বর্তমানে যদি কারাগারের পুরাতন প্রথা উঠে গিয়ে নতুন নিয়মের প্রবর্তন হয়ে থাকে ভালই। আমি কাবুলে থাকার সময় আব্দুল্লা নামে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন যে আফগানিস্থানে অনেক আইনকানুন সত্বরই রদবদল হবে। তাঁকে শুভস্য শীঘ্রং করতে বলেছিলাম। তিনি হেসে বলেছিলেন, এদেশের কারাগারে আপনার আগমনের সম্ভবনা আছে নাকি? তাঁকে বলেছিলাম, আমার শত্রুও যেন এরূপ কষ্টে না পড়ে।

রাত কাটল। পরদিন ফের রওয়ানা হলাম এবং দুটি কাস্টম হাউস পার হয়ে কাবুল শহরে পৌছলাম। কাবুল শহরে পৌছবার পূর্বে ইয়াকুবের সংগে কথা হল, যদি আমি কান্দাহারে মোটরে করে যাই তবে সেও যাবে এবং উভয়ে একত্রে থাকবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করব। কিন্তু কাবুলে পৌছেই ইয়াকুব অন্যত্র চলে গেলে, কারণ তার গতিবিধি পুলিশ পছন্দ করছিল না। ইয়াকুবও ছিল নাছোড়বান্দা ছেলে, কান্দাহারে আবার সে আমার সংগে হিরাত যাবে বলে মিলিত হয়েছিল। সে সব কথা পরে হবে।

কাবুল

এই সেই কাবুল। অনেক ঐতিহাসিক তথ্য কাবুলের সংগে জড়িত আছে। অনেক দূরে দাঁড়িয়ে কাবুল সহরের দৃশ্য দেখলাম। পাহাড়ের উপর মস্ত বড় একটি দুর্গ কে তৈরী করেছিল জানবার ইচ্ছা ছিল না। তবুও দুর্গটা দেখলাম ভাল করে। ভারতের যে কোন দুর্গ কাবুল দুর্গ হতে বড় এবং সংরক্ষিত; তবু আফগান জাতি একক ভারতের কতক অংশ বিজয় করে ভারত শাসন করেছিল। সতর জন পাঠান বঙ্গদেশ জয় করেছিল। এত সাহস, এত শক্তি তারা কোথা হতে পেয়েছিল? এই প্রশ্ন আপনা হতেই মনে আসে এবং এর সুমীমাংসা না হলে রহস্যে পরিণত হয়। রহস্যের ধার ধারতাম না। সেজন্য রহস্য বলে কিছু আমার কাছে ছিল না।

অনেকক্ষন দাঁড়ালাম, তারপর আর ইচ্ছা হল না সহরটার বাইরের দিকে চেয়ে থাকি। ইচ্ছা হল সহরটার ভেতর দিকটাই দেখি। সর্বপ্রথমই এলাম কাবুল হোটেলের কাছে। সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে উপরে উঠলাম। আনন্দ করে এক কাপ ইংলিশ চা খেয়ে শরীরটার অবসাদ দূর করে বেড়িয়ে পড়লাম সহর দেখতে।

সহর মামুলী ধরণের গড়া। যে কোন পাঞ্জাবী-সহর কাবুল সহর হতে বড়। ঘরগুলিও পাঞ্জাবী ধরণে তৈরী। বিশেষত্ব কিছুই অনুভব করলাম না—অন্তত বাড়ি ঘরের দিক থেকে। কোথাও নৃত্যগীতের অথবা সিনেমা হাউস ছিল না। নৃত্যগীত অথবা সিনেমা দেখা নাকি ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। আমাদের দেশে যারা নৃত্যগীত অথবা সিনেমা দেখা পছন্দ করেন না তাদের পক্ষে কাবুল সহরে যেয়ে বসবাস করাই ভাল কিন্তু চায়ের দোকান সর্বত্র। চায়ের দোকানে আবার জাতিবিচার নেই। সবাই প্রবেশ করতে পারে এমন কি মেথর পর্যন্ত!

সহরটাতে চক্কর লাগাতে দু ঘণ্টার বেশি লাগল না। বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের বাসস্থান থেকে আরম্ভ করে রাজবাড়ী দেখে ভাবলাম, এই ত কাবুল সহর। এখন বেড়িয়ে পড়লেই হয়, কিন্তু দেখা হয়েছে পাহাড় পর্বত, ইট-চুণের বাড়ি, যাদের প্রাণ নেই। এবার মানুষ দেখতে হবে। মানুষ দেখতে সময়ের দরকার। কোথাও না থেকে মানুষের সংগে মেলামেশা করা চলে না।

অনেকক্ষণ ভ্রমণ করার পর হঠাৎ বুঝতে পারলাম সহরের বুক চিরে একটি নদী বয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা হল, জেনে নিই এই কল্লোলিনীই কি সেই নদী যার নাম কাবুল নদী? কিন্তু কাউকে সে কথা জিজ্ঞাসা না করে নদীতে নেমে হাত মুখ ভাল করে যখন মোজা পায়ে দিচ্ছিলাম তখন এক জন লোক জিজ্ঞাসা করল "তুমি কে?"

আমি পথিক—যাকে তোমরা মুসাফির বল। আমি দুনিয়ার মুসাফির, এই হল আমার পরিচয়। জিজ্ঞাসু লোকটিকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেলাম না; সে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। তার দিকে চেয়ে দেখলাম সে ধনী অথবা শিক্ষিত লোক নয়, গরীব লোক। গরীব লোক এই পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে পেরেছে তাই যথেষ্ট। আমাদের দেশের গরীব মুখ বুঝেই জীবনের শেষ করে, এখানের গরীব যে মুখ ফুটে প্রশ্ন করতে পারছে সে জন্য সে নিশ্চয়ই ধন্যবাদের পাত্র।

কাবুলের কালী-মন্দিরেই প্রথমে যাব স্থির করেছিলাম। কালী-মন্দিরে যাবার একমাত্র কারণ হল, সেখানে নাকি একটা সরাই বা ধর্মশালা আছে। ভেবেছিলাম ধর্মশালাতেই গিয়ে দু এক দিন থাকব, তারপর হোটেলে যেতে পারব। পথের লোককে জিজ্ঞাসা করে কালী-বাড়ীতে পৌঁছতে পারলাম এবং দরজার কড়া নাড়লাম। কয়েকবার কড়া নাড়তেই পূজারী দরজা খুলে দিলেন। লোকটিকে দেখে মনে হল তিনি মন্দিরে হয়তো কোন কারণে এসেছেন, পূজারী নন। লোকটির পোশাক মামুলী ধরনের পাঠানদের মত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তিনিই পূজারী। তখন আমিও তাঁকে আমার পরিচয় দিলাম।

মুসাফিরখানার কথা জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এখানে পৃথক কোন ধর্মশালা নাই। পূজারী মন্দির-সংলগ্ন একটা ঘর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, অতিথি এলে ঐ ঘরটাতেই যায়গা করে দেওয়া হয়। সারাদিন সাইকেল চালিয়ে বড়ই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, নতুন করে আস্তানা যোগাড় করার আর উৎসাহ মোটেই ছিল না। কাজেই পূজারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম না।

পূজারী আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেই ঘরে চলে গেলেন। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘরের গড়ন, মন্দিরের নির্মাণ-কৌশল এসব ভাল করে দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর পূজারী ফিরে এসে আমাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে প্রজ্বলিত সন্দল ছিল, তারই পাশে বিশ্রাম করতে বসলাম। আমাকে ঘরের ভেতর বসিয়ে রেখে পূজারী আবার চলে গেলেন।

মন্দিরে তিন খানা মেটে ঘর। একটি উত্তরে, অপর দুটি পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে অবস্থিত। প্রত্যেক ঘরের বারান্দার সংগেই পরস্পরের যোগাযোগ রয়েছে। শীতের দেশের ঘরগুলি এরূপ করেই তৈরী হয়ে থাকে। কালী-মন্দির উত্তরদিকে অবস্থিত। পূর্বদিকের ঘরে রান্না করা হয় এবং পশ্চিম দিকের ঘর অতিথির জন্য। ঠাকুর রান্নাঘরেই শোন বলে মনে হল। সন্দলের কাছে বেশীক্ষণ বসে থাকতে ভাল লাগল না, পাশেই একটা বড় বালিশ ছিল, তাতেই হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ শুয়েছিলাম জানি না, যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখলাম পূজারী আমার ভোজনের বন্দোবস্ত করছেন। ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো আমাকে বিছানার বাইরে বসে খেতে বলবেন, কিন্তু তা তিনি বলেন নি। বিছানার ওপর বসেই খেয়ে নিলাম। আফগানিস্থানে এঁটোর বালাই নেই। যত এঁটোর বালাই শুধু ভারতেই। পৃথিবীর আর কোথাও এঁটো বলে কিছু নেই। আমাদের দেশের জ্ঞানীগণ বলেন, এঁটো মেনে চলা ভাল, তাতে নাকি স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের অজ্ঞতা দারিদ্র এবং সর্বোপরি সরকারের ঔদাসীন্যের ফলে তারা নানা ভাবে স্বাস্থ্য হারাচ্ছে। তাদের

মাঝে স্বাস্থ্যরক্ষার অজুহাতে এঁদের গোঁড়ামিকে বজায় রাখার সার্থকতা কি তা বোঝা আমার পক্ষে শক্ত।

আহারের পর একবার কালীমূর্তি দেখতে গিয়াছিলাম। কালীমূর্তির কাছে নারায়ণেরও একটি বিগ্রহও ছিল। বিগ্রহগুলিকে যখন মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছিলাম তখন নিশ্চয়ই ঠাকুর ভাবছিলেন আমি একজন মহাভক্ত। কিন্তু তিনি জানতেন না, আমি ভক্তির প্রেরণায় মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে থাকিনি—দেখছিলাম শুধু তার গঠনপ্রণালী।

কয়েক সপ্তাহ ক্রমাগত চলার ফলে শরীরটা নেতিয়ে পড়েছিল। সেজন্য খাওয়ার পর বাইরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। সন্দলের কাছেই বসে আফগানিস্থানের মানচিত্র দেখতেছিলাম।

বেলা বোধ হয় তখন ছ-টা। এরই মাঝে পূজারী তাঁর সহকারীসহ বাহির হতে ফিরে এসে বললেন "রাত্রে মন্দিরে থাকতে দেওয়া হবে না।" আমি তাঁদের কথা শুনে আস্তে ধীরে বললাম "যে-পর্যন্ত আমার থাকার অন্য বন্দোবস্ত না হচ্ছে সে পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ব না এবং আমার অন্যত্র থাকার বন্দোবস্ত তাঁদেরই করতে হবে।" আমার দৃঢ়তা দেখে পূজারী দুজন বাইরে চলে গেলেন। কতক্ষণ পর আবার যখন তাঁরা ফিরে এলেন তখন তাঁদের সংগে আরও একজন দীর্ঘকায় বৃদ্ধ লোক ছিলেন। বৃদ্ধ এসেই আমাকে নমস্কার করে বললেন তিনি বিষ্ণু মন্দিরের পূজারী এবং তাঁর মন্দিরেই আমার রাত কাটাবার সুবন্দোবস্ত হয়েছে। আমি কোন কথা না বলে সাইকেলটা টেনে নিয়ে তাঁর সংগে চললাম।

আমাদের পথের বাঁদিকে রুশিয়ার কনসালের বাড়ী। কনসালের বাড়ীর উপর মস্তবড় একখানা আধুনিক রুশিয়ার পতাকা পত পত করে উড়ছিল। তারপরই ডানদিকে পড়ল জাপানী কনসালের বাড়ী। ছোট একটা সূর্য-মার্কা পুরাতন ময়লা কাপড় ঘরের দরজার কাছে ঝুলছিল। তারপরই আরম্ভ হল

উঁচুভূমি। দু'দিকে সারি সারি মেটে ঘরগুলি দাঁড়িয়ে ছিল। প্রত্যেকটি ঘরেরই দরজা বন্ধ। পথে লোকের চলাচল নাই বললেই চলে।

মেটে ঘরের সারি দেখে কতকক্ষণ চলার পর বিষ্ণু মন্দিরের পূজারীর বাড়ীর সামনে এলাম। কড়া নাড়া মাত্র একটি যুবক দরজা খুলে দিল। যুবকটিকে দেখে বেশ সরল বলে মনে হল। পরে জানলাম এই যুবক পূজারীর ছোট ছেলে। ছেলেটির গালভরা হাসি দেখে আপনা হতেই তার সংগে কথা বলতে ইচ্ছা হল এবং তারই সংগে কথা বলে ঘরে প্রবেশ করলাম।

বিষ্ণু মন্দিরের পূজারী শ্রেণীতে সাহা মানে বৈশ্য। এখানেও তিনখানা ঘর এবং সেই একই ধরনে তৈরী। বসবার ঘরে এসে দেখলাম আমার অপেক্ষায় অনেকগুলি লোক বসে আছে। তারা প্রত্যেকেই আমার সংগে কথা বলবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েই বোধ হয় অপেক্ষা করছিল। একজন ব্রাহ্মণও সেখানে ছিলেন। তাঁর একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি তাঁর প্রতিটি বক্তব্য শেষ করে উপসংহারে বলতেন, যারা ধর্ম বজায় রেখে চলতে পারে না তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করাই উচিত। যেন ধর্মটাই মানুষের প্রাণ।

দিনের অবসান হয়ে রাত্রি এল। সকলেই চলে গেল, থাকলাম শুধু আমি এবং পূজারীর একটি ছেলে। পরদিন প্রভাতে চা-পানের পর লক্ষ্য করলাম এখানকার পূজারীর মনও যেন আমার ওপর বিরূপ। তাঁর সে ভাব বুঝতে পেরে বললাম, ঠাকুর মশায়, এখান হতে আমাকে তাড়াতে পারবেন না, আমি এক মাস এখানে থাকব। খরচ যা লাগে তা দেব, কিন্তু এখান হতে চলে যাও, অথবা এখানে এক দিনের বেশি থাকবার নিয়ম নেই—এসব কথা বললেই, হয়তো আপনাকেই এখান থেকে তল্পীতল্পা গুটাতে হবে। এটা দেবমন্দির, সকল হিন্দুর অর্থ-সাহায্যে এটা তৈরী হয়েছে, আমারও এতে অধিকার আছে। জানেন তো, হিন্দুস্থানের অনেক হিন্দু-মন্দিরই সার্বজনীন হয়ে গেছে। আফগানিস্থানেও যদি আমি সেরূপ কিছু করতে প্রয়াসী হই তবে দরিদ্র হিন্দুরা নিশ্চয়ই আমার সহায়

হবে। এরূপ অবস্থায় ভেতরের কথাটা আমাকে খুলে বলাই আপনার পক্ষে ভাল হবে। আমার অনুমান হয় আপনারা সরকারী হাঙ্গামাকে এড়াবার জন্যই এরূপ করছেন। তাই যদি হয় তবে আমি আপনাকে আশ্বাস দিয়ে বলছি, সরকারের তরফ থেকে আপনার উপর কোন বিপদই আসবে না।

পূজারীর সংগে আর কথা হল না। ঘরে বসে থাকতেও আর ইচ্ছা হল না, শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। কাবুল শহরের বুকের উপর যে প্রসিদ্ধ রাজপথ আছে তার নাম আমি জানতাম না, এখনও জানি না। তবে পথের প্রসিদ্ধির কারণ আমাকে জানতে হয়েছিল। এই পথের ওপরই হোটেল কাবুল।

মন্দির হতে বের হয়েই এক বৃদ্ধ পাঠানের দোকান থেকে এক প্যাকেট রাশিয়ান সিগারেট কিনলাম। দোকানী আমার মুখের দিকে একটু তাকাল, তারপর সিগারেট দিয়ে বিদায় করল। আর একটু এগিয়ে গিয়ে একটি চা-এর দোকান দেখতে পেলাম। আমার অভ্যাসই হল চা-এর দোকানে যাওয়া এবং সেখানে বসে নানারূপ সংবাদ সংগ্রহ করা। এই দোকানটি উচ্চ শ্রেণীর ইউরোপীয় ধরনের। সুন্দর এক একটি গোল টেবিলের চারপাশে ভেলভেট মোড়া সোফা। টেবিলের ওপর ছাইদানী এবং দেশলাই ছাড়া আর কিছু ছিল না। ডিপ্লোমেটরা টেবিলের ওপর বাজে জিনিস কিছুই পছন্দ করেন না। সেজন্য মনে হয়েছিল এটাও ডিপ্লোমেটদেরই একটা আড্ডা।

আফগানিস্থানে দু রকমের চা-এর প্রচলন আছে, যথা—ইংলিশ চা এবং "চায়"। দারজিলিং সিংহল এবং আসাম হতে আফগানিস্থানে যে চা যায় তাকে ইংলিশ চা বলা হয়। ইংলিশ চা-তে দুধ এবং চিনির দরকার হয়। "চায়" আসে চীন দেশ থেকে। সেই পাতা গরম জলে ভিজিয়ে দিলেই ক্বাথ বের হয়। সেই ক্বাথকেই বলে "চায়"। এই দোকানে "চায়" এর প্রচলন ছিল না। আমি চা-এর আদেশ দিয়ে একটি সিগারেট [illegible] সময় আমার গরিবানা পোশাক দেখে বয় বললে "হুজুর

রাজপ্রসাদের তোরণ-দ্বার

রাজপ্রসাদ

রাজপথের দৃশ্য
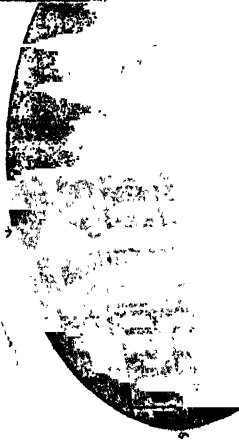
এখানের চাএর দাম খুব বেশি এবং এখানে "চায়" বিক্রি হয় না।" আমি বললাম "চা-এর যদি বেশি দাম হয় তবে কাফি নিয়ে এস। দু' কাবুলির বেশি বোধ হয় হবে না।" লোকটি বুঝল আমার কাছে টাকা-পয়সা আছে। সে ফের বলল "চা আনব না কাফি আনব হুজুর?" কাফিই নিয়ে এস—বলে পকেট হতে কতকগুলি কাগজ বের করে সে দিকে মন দিলাম। অনেক দিনের জমানো কথা ডায়েরিতে লিখতে পারি নি। এরূপ নিরিবিলি এবং এত আরামদায়ক স্থানে বসলেই লিখতে ইচ্ছা হয়। আফগানিস্থানে কাফি মোটেই ব্যবহার হয় না। তাই বয় চা আনতেই বাধ্য হল। সে চা নিয়ে এলে তার মুখের দিকে একটু ভাল করে তাকিয়ে বুঝলাম লোকটি পাঠান নয়—বিদেশী; ছদ্মবেশে এখানে আছে। পরে বুঝতে পেরেছিলাম এই লোকটি সত্যসত্যই পাঠান নয়—সে একজন ভারতবাসী।

এক কাপ চা খেয়ে চায়ের পিপাসা মিটল না। ফের পুনরায় এক কাপ চা আনতে বলার পূর্বেই প্রথম কাপের দাম চুকিয়ে দিতে যাব এমন সময় বয় বলল, "এক সঙ্গে দিলেই হবে।" কথা কয়টি শুনে আশ্চর্য হলাম। একেবারে খাঁটি বাঙলা ভাষা। একজন বাঙালী এই সুদূর দেশে চায়ের দোকানে বয়ের কাজ করছে দেখে যদিও চমৎকৃত হলাম তথাপি মুখে কিছুই প্রকাশ করলাম না। বয় দ্বিতীয়বার চা নিয়ে এলে বললাম "এক প্যাকেট সিগারেট আনিয়ে দিতে পারেন?" লোকটি হঠাৎ যেন আকাশ হতে পড়ল, তারপর বলল—"আপনি কি বললেন?" আমি বললাম, "হাম বলা, ইদার মে সিগারেট মিলেগা?"

—জরুর জনাব, পয়সা দিজিয়ে—বলেই লোকটি হাত পাতল। পাঁচটি কাবুলি মুদ্রা তার হাতে দিয়ে বললাম, এই নাও। লোকটি সিগারেট নিয়ে এল এবং বাকি পয়সা ফিরিয়ে দিল।

চায়ের দোকান হতে বেরিয়ে আসার পর শুনলাম দুজন লোক হো হো করে হাসছে। যাকগে, বিদ্রূপের হাসি হাসল তো বয়েই গেল। এখন একবার বৈদেশিক সচিবের সংগে সাক্ষাত হলে ভাল হয়, মনে করে তাঁরই বাড়ির দিকে অগ্রসর হলাম। অলিগলি পথ ধরে চলে যখন বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করছিলাম, তখন ভাবলাম এখন আর বৈদেশিক সচিবের বাড়িতে যাবার দরকার নেই। চায়ের দোকানে গিয়ে আর এক পেয়ালা চা খেয়ে পুরোহিত মশায়ের আশ্রয়ে গিয়ে বিশ্রাম করাই উচিৎ। এই ভেবে চায়ের দোকানের দিকে চললাম।

কিন্তু চায়ের দোকানের পথটার কোন হদিসই পেলাম না। অবশেষে পথচারীদের জিজ্ঞাসা করে কাবুল হোটেলে এলাম। কাবুল হোটেল পূর্বোক্ত চায়ের দোকানের কাছেই। দ্বিতীয় বার আমাকে চায়ের দোকানে ফিরে আসতে দেখে ছদ্মবেশী বয় একটু থতমত খেয়ে গেল। ইংলিশ ভাষাতে বললাম "চা খেতে আমার বড়ই ভাল লাগে। এখানে আপনারাই সব চেয়ে সেরা চা প্রস্তুত করেন। আমাকে এখানে বারবার আসতেই হবে। আর এক কাপ চা দিন দয়া করে।" বয় চা নিয়ে এল। চা পান করে মন্দিরে ফিরে এলাম। পথে বার বার শুধু মনে পড়তে লাগল সেই কথাটি—"এক সঙ্গে দিলেই হবে।"

এখানে আমার পোশাক সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। তখনও শীত আরম্ভ হয় নি। হাপ্‌পেন্ট পরিত্যাগ করে ব্রীচেস্‌ পরতে আরম্ভ করেছিলাম। ব্রীচেসের নীচে ছিল একটা গরম পাজামা। এতে শীত নিবারণ হ'ত বেশ ভাল করেই। শরীরে ছিল একটা সার্ট। তার উপর দু'টা গরম গেঞ্জী। তার উপর আর একটা সার্ট। যখন বাইরে যেতাম তখন এর উপরে থাকত একটা গরম কোর্ট। মাথায় থাকত সোলার হেট। এতেই অনুভব হবে শীত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কিরূপ ব্যগ্র ছিলাম।

মন্দিরে ফিরে এসে দেখলাম পূজারী আমার জন্যও রান্না করেছেন। কিন্তু তাঁর মনে সন্দেহের ঝড় উঠছে। সেই ঝড় কোন্ দিকে বইবে তা তিনিই জানেন। যাহোক, আমি হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসলাম। রান্না হয়েছিল খিচুড়ি। খিচুড়িতে প্রচুর ঘি দেওয়া হয়েছিল। এদেশে ঘি দরিদ্র লোকের ভাগ্যে জুটে না। ঘি খান ধনীর দল। বিষ্ণু মন্দিরের পূজারীও একজন ধনী লোক। তাঁর বাড়িতেও সবসময় বস্তা বস্তা চাউল, চিনি এবং টিন ভর্তি ঘি মজুত থাকে।

পূজারী ঠাকুর ভোজনের পূর্বে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, তারপর ধীরে ধীরে আঙুলের সাহায্যে খেতে আরম্ভ করলেন। অন্যান্যেরাও সেরূপ ভাবে খেতে আরম্ভ করল। শুধু আমি চামচের সাহায্যে খাওয়া সুরু করলাম। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পূজারী প্রত্যেকের থালা পরীক্ষা করে দেখলেন, খাদ্যের এক কণাও কারো থালাতে লেগে আছে কি না? পরিদর্শন হয়ে গেলে তিনি ভৃত্যকে থালাগুলি নিয়ে যেতে বললেন। চা তৈরীই ছিল। ভাত খাওয়ার পর চা খাওয়া হল। আহারাদির পালা শেষ হলে নাক ডাকিয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম।

বিকাল বেলা স্থানীয় হিন্দু-প্রতিনিধি বলে কথিত একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি আমার সংগে দেখা করতে এলেন। মুখ দেখেই লোকটিকে খল প্রকৃতির মনে হল। কায়দামাফিক নমস্কারের আদান-প্রদান সারা হলে প্রৌঢ় বললেন "আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি, কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত একটি কথা বলতে হচ্ছে—আপনি কথাগুলি মন দিয়ে শুনুন। এখানকার নিয়মমতে, যে-কোন ভারত-বাসী এদেশে আসুক, কাবুলে পৌছাবার পরই তাদের প্রত্যেকেরই আমার কাছে রিপোর্ট করতে হয়, আপনি তা করেন নি। আমার এখন কর্তব্য হল, আপনাকে পুলিশ অফিসারের কাছে হাজির করা। তাঁর আদেশ অনুসারে প্রত্যেক কুড়ি দিন অন্তর আপনাকে পুলিশ স্টেশনে গিয়ে অথবা আমার কাছে এসে আপনি কি ভাবে জীবন কাটাচ্ছেন তার রিপোর্ট দিতে হবে। এ কথাটা পুলিশ অফিসারের

সামনেই আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। আমি দোভাষীরও কাজ করি। আপনি কাবুলে আসার পর আমার কাছেও যান নি, কোন পুলিশ অফিসারের কাছেও যাননি; সেজন্য হয়তো আপনাকে কষ্ট পেতে হবে। উপরন্তু আপনি আফগানিস্থানে পৌছেই পল্টনি অফিসার, ছাত্র এবং জনসাধারণের সংগে অবাধে মেলামেশা করছেন। এসব আফগান সরকারের মনঃপূত হবে কিনা জানি না। যা হোক আপনাকে কাল আমার সংগে পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে।"

প্রৌঢ় যদিও আফগানিস্থানেরই বাসিন্দা এবং কোনও উপজাতিরই লোক নহেন, তবুও তাঁর কথায় গোলামী ভাবের বেশ একটা ছাপ ছিল। এত কষ্ট করে একটা স্বাধীন দেশে এসেছি, এখানেও দেখছি গোলামির প্রভাব। কিন্তু আমি পাঠান ছেলেদের সংগে থেকে মনের ভাব অনেকটা পরিবর্তন করেছিলাম। বললাম "মশাই, এসব আইন কানুনের ধার ধারি না, কাল সকালে যদি আমাকে পুলিশ স্টেশনে যেতে হয় তবে আপনি টমটম (এক-ঘোড়ার গাড়ি) নিয়ে আসবেন। নতুবা যাব না। আপনার শক্তি অনুযায়ী যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।"

প্রৌঢ় একটু কুপিত হয়ে বললেন "আপনার মত অনেক লোক দেখেছি সাহেব। এইতো তিন চার বৎসর পূর্বে পাঞ্জাব হতে কতকগুলি মুসলমান ছাত্র এসেছিলেন। তাঁরা গোঁ ধরে বললেন, আমার সংগে সাক্ষাৎ করবেন না। মুসলমান অফিসার ছাড়া আর কারো সংগে কথা বলবেন না। কিন্তু তাঁরা জানতেন না এদেশে ধর্মের হিসাবে কর্মচারী নিয়োগ হয় না। রাষ্ট্রগত ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি এখানে ভারতবর্ষের লোকজনের তদ্‌বির করি, সে যে-কোন ধর্মের লোকই হোক। কিন্তু তাঁরা তা চান নি। তাঁরা চেয়েছিলেন আমার স্থলে একজন মুসলমান নিযুক্ত হোক। আমি হলাম তিন যুগের ভুষণ্ডী কাক। আমান উল্লা, বাচ্চা-ই-সাক্কো, নাদির শা এই তিন জনকেই আমি দেখেছি। বর্তমান রাজা জাহির শা আমাকে নতুন নিয়োগপত্র দিয়েছেন। এর

পূর্বেও আমি এ কাজই করতাম। আপনি বলছেন আমার কথা শুনবেন না, কালই দেখব আপনার কত শক্তি।"

আমি বললাম "আমার প্রসংগ এখন বাদ দিয়ে বলুন তো ঐ পাঞ্জাবী মুসলমান যুবকদের কি হয়েছিল?"

—তাঁদের হবে আর কি। এখানে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন নাই, আমি আমার স্থানেই রয়ে গেলাম, তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হল।

আমি বললাম "আমাকেও না হয় তাড়িয়ে দেবেন, আর কি করতে পারেন বলুন?"

প্রৌঢ় হেসে বললেন, তবে এদেশে না এলেই পারতে।

পরদিন ভোরবেলায় আবার তিনি এসে হাজির হলেন। আমি তখনও লেপের নিচেই ছিলাম। অনিচ্ছায় লেপ ছাড়তে হল। হাত ধুয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে বসলাম গিয়ে টমটমে। টমটম প্রবল বেগে পুলিশ স্টেশনের দিকে চলল। সকাল বেলা যারা পথে বের হয়েছিল আমাকে ঐ প্রৌঢ় রাজকর্মচারীটির সংগে দেখে তারা অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিল। আমার মনে হল লোকটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত নীচাশয়, নতুবা যে তাকে দেখছে সে-ই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কেন? আমি মনের ভাব গোপন না করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দেখছেন কি, যে আপনাকে দেখছে সে-ই ত মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে? আপনার প্রতি এ বিরাগের কারণ কি বলুন তো?"

উত্তর হল, এসব কারণ এখন বলা হবে না, তোমাকে একবার পুলিশ স্টেশনে হাজির করি, তারপর অন্য সময় এসব কথা হবে।

লক্ষ্য করলাম, লোকটির কথাবার্তায় ক্রমেই শিষ্টাচার লোপ পাচ্ছে।

পুলিশ অফিসারের অফিস শহরের একটু বাইরে। বাড়িখানা একতালা মেটে ঘর। বর্তমান সভ্যতার ছাপ তাতে একটুও পড়েনি। বাড়ির বাইরে একটিও লোক ছিল না। এখানেও দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তে হল। কড়া

নাড়তেই একজন দরজা খুলে দিল, আমরা একটি ছোট রুমে বসলাম। রুমটির সামনেই একটা লম্বা ঘর। সেই ঘরটার বিপরীত দিকেও আর একটা ঘর। সেই ঘরটাতে অফিসার বসে ছিলেন। কাবুল শহরের সবচেয়ে বড় অফিসারের বাসস্থান এবং তাঁর অফিসের সংগে আমাদের দেশের যে কোন থানার দারোগার অফিস এবং তাঁর থাকবার ঘরের তুলনা করতে পারা যায় না। কাবুলী দারোগার অফিস এবং থাকবার ঘর আমাদের দেশের থানা ও অফিসারের বাসগৃহের কাছে এত নিকৃষ্ট যে তুলনাই করা যায় না। কিন্তু কাবুলের পুলিশ আমাদের দেশের দারোগা মহাশয়দের মত উগ্রস্বভাব নন। তাঁরা বেশ শান্ত এবং ভদ্র। তাঁরা ভাল করেই জানেন, রাজার রাজত্ব যে কোন সময় যেতে পারে, কিন্তু জনসাধারণ থাকবে। সর্বসাধারণের দেওয়া মাইনে আবার নতুন করে পেতে হলে সর্বসাধারণকে সন্তুষ্ট রাখা বিশেষ দরকার।

পুলিশ অফিসার দু এক মিনিটের মধ্যে এসেই ফরাসী ভাষায় কথা বলতে বললেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন আমি ফরাসী ভাষা জানি। আমি জানালাম, ফরাসী ভাষায় আমার ব্যুৎপত্তি নেই, তবে হিন্দুস্থানী এবং ইংলিশ বলতে পারি। অফিসার ইংলিশ জানতেন কিন্তু ইংলিশ বলতে তিনি মোটেই রাজী ছিলেন না। আমার কাছে কিন্তু ইংলিশ এবং ফ্রেঞ্চ উভয়ই বিদেশী। ফরাসী ভাষা আমার জানা না থাকায় এবং পুলিশ অফিসার ইংলিশ ভাষায় কথা বলতে অনিচ্ছুক হওয়ায় আমরা হিন্দুস্থানী ভাষাকেই বাহন করে কথা বলতে আরম্ভ করলাম। প্রৌঢ় রাজকর্মচারী আমাদের কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভাবেন নি আফগানিস্থানের একজন উচ্চতম পদের পুলিশ অফিসার আমাকে এত সম্মান ও প্রীতি দেখাবেন। দুভাষী মহাশয় দাঁড়িয়েই ছিলেন। আমরা বসে কথা বলছিলাম এবং চা-ও খাচ্ছিলাম। কথা প্রসংগে পুলিশ অফিসার বললেন, আপনাকে প্রত্যেক কুড়িদিন অন্তর এখানে এসে অথবা নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে।

—আমাদের দেশে হাজার হাজার কাবুলি বসবাস করছে, তারা তো পুলিশ স্টেশনে কুড়িদিন অন্তর হাজিরা দেয় না ?

—সে সংবাদ আমরা রাখি। আমরাও চাই আপনারা আমাদের দেশে কুড়িদিন অন্তর পুলিশ স্টেশনে হাজিরা না দেন। লক্ষ্য করে দেখবেন যখনই আপনি কোন পুলিশ স্টেশনে হাজিরা পরওয়ানা নিয়ে হাজির হবেন, তখনই পুলিশ অফিসার আপনাকে সত্বর বিদায় দিতে পারলেই যেন রক্ষা পান এমনি ভাব দেখাবেন। আমরা এসব চাই না, তবে কিনা—

—আর বলতে হবে না, আমরা মানুষ নই বলেই এই ব্যবস্থা।

—আপনারা আমাদের মত হন এই আপনাদের কাছে প্রার্থনা। নিন, আর এক পেয়ালা চা খান।

—আর চা খেয়ে লাভ নেই—এখন বিদায় হতে চাই, কিছুই ভাল লাগছে না।

—আপনার ইচ্ছা। এখানে আটকে রাখার জন্য আপনাকে আনা হয় নি। যখনই দরকার হবে তখনই উর্দুভাষাভাষীদের তত্বাবধায়ককে বলবেন, তাঁর সাধ্যায়ত্ত হলে তিনি সাহায্য করবেন, নতুবা আমার কাছে চলে আসবেন।

—এই ভদ্রলোক কি হিন্দু-তত্বাবধায়ক নন ?

—না, ইনি তো হিন্দু নন, দুভাষী।

—তবে তিনি হিন্দু-প্রতিনিধি বলে পরিচয় দেন কেন ?

—প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থানের যত লোক এখানে বসবাস করে তাদের ভালমন্দ তিনি দেখতে থাকেন। হিন্দুস্থানের বাসিন্দাকে বৃটিশরা বলে ইণ্ডিয়ান, ফরাসীরা বলে হিন্দুঁ। আমরা এখানে বৈদেশিক ভাষা ফ্রেঞ্চ ব্যবহার করি, সেজন্যই এঁকে হিন্দু-প্রতিনিধি বলা অসংগত হয়নি।

—আপনি বললেন হিন্দুস্থানের বাসিন্দা উর্দুতে কথা বলে ; আমরা কিন্তু উর্দু বলতে অন্য আর একটা ভাষা বুঝি।

—আপনারা যাই বুঝুন, আমরা বুঝি ভারতের সর্বসাধারণ যে মিশ্রভাষা বলে তারই নাম উর্দু—মানে হল মিশ্রভাষা।

পুলিস অফিসারে সদ্ব্যবহার দেখে হিন্দু তত্ত্বধায়কের মনের পরিবর্তন হল। পথে এসে তিনি আমার সংগে মধুর বচনে আলাপ করলেন এবং বললেন যে পূজারীকে বলে কয়ে তিনি আমার আরও ভালভাবে থাকবার বন্দোবস্ত করে দেবেন। বিষ্ণু মন্দিরে এসে তিনি আমার সামনেই পোস্ত ভাষায় পূজারী ঠাকুরকে কি বললেন। দেখতে দেখতে পূজারী ঠাকুরেরও মনোভাবের আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেল। আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

কয়েকদিন থেকে আমার স্নান হয়নি। কাবুলে আসার পর স্নানগারের সন্ধানও কারো কাছে জিজ্ঞাসা করিনি। পূজারীকে স্নানাগারের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন "মন্দিরে স্নানাগার নাই, সরকারী স্নানাগারে গেলেই সুবিধা হবে। তারপরেই বললেন, হিন্দুরা সাধারণত রাত্রিবেলাই স্নানাগারে স্নান করতে যায়, আমিও যেন তাই করি।" জিজ্ঞাসা করলাম "দিনে হিন্দুরা স্নানাগারে যায় না কেন?" পূজারী বললেন "যায় না কেন, তা হিন্দুপ্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করুন।" হিন্দুপ্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই তিনি বললেন "মুসলমানেরা দিনে স্নান করতে যায়, আমরা যাই রাত্রে।" আমি বললাম "এই জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার ফুরসৎ আমার নেই। ইচ্ছা করলে দিনের বেলাতেও স্নান করা যায়, এইটেই হচ্ছে আপনার কথার সারমর্ম নয় কি?" হিন্দুপ্রতিনিধি আমতা আমতা করতে লাগলেন দেখে চটে গেলাম। বললাম "স্নানাগারটি কোথায় দেখিয়ে দেবার জন্য একজন লোক দিলেই হবে, এখনই আমি স্নান করতে যাব।"

পূজারীর বড় ছেলে কাছেই বসে'ছিল, সে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজি হল। আমরা উভয়ে ঘর হতে বেরিয়ে স্নানাগারের দিকে রওনা হলাম।

পথে মাংসের, মাছের এবং সব্জির বাজার দেখে গেলাম। ইচ্ছা, পরে এসে কিছু সব্জি কিনে নিয়ে যাব। কতকগুলি মাংসের দোকানে দেখলাম ইহুদিরাই শুধু মাংস কিনছে, হিন্দু অথবা মুসলমান সেখানে যাচ্ছে না। পূজারীর ছেলে বলল, "এখানে ইহুদিদের জন্য পৃথক কসাইখানা আছে। ইহুদিরা মুসলমানদের জবাই করা জীবের মাংস খায় না। ইহুদিদের জীবহত্যার পদ্ধতি মুসলমানাদর মত নয়, তারা শুধু কণ্ঠনালিটাই কাটে, মুসলমানরা তা না করে গলার দুদিকের দুটা রগ পর্যন্ত কেটে দেয়।" দু'রকমের কশাইখানা দেখে মনে হল ইচ্ছা করলেই এখানে আচার ব্যবহারের পার্থক্য বজায় রাখতে পারা যায়। উভয়ে স্নানাগারের কাছে এলাম। পূজারীর বড় ছেলে আমাকে স্নানাগারের দরজার কাছে রেখেই নিকটস্থ একটি হিন্দু দোকানে গা-ঢাকা দিয়ে বসে রইল।

স্নানাগারে প্রবেশ করেই স্নানাগার-রক্ষককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম "মাথার টুপিটা কোথায় রাখা যায়?" সে কাছেই একটা খুঁটি দেখিয়ে দিল। সেখানে কোট, টুপি, মাফলার ইত্যাদি রেখে স্নানাগারের দিকে যাচ্ছি এমন সময় দারোয়ান বললে "আপ মুসলমান হ্যায়?"

আমি বললাম "নেহি। সাবুন কিদার হ্যায়, টাওয়েল কিদার হ্যায়? তুম্ বহুত বুদ্ধু আদমি হ্যায়, মুসলমানিসে তোমরা কিয়া জরুরত?"

—হুজুর কুছ নেই, আবি সব চিজ্ লে আতাহে।

—জলদি লে আও।

সাবান এবং টাওয়েল বাথরুমে রেখে দিয়ে বয় সেলাম ঠুকে বললে "সব ঠিক হ্যায়।"

স্নানাগারে প্রায় ঘন্টা খানেক ছিলাম। স্নান করে যখন স্নানাগার হতে বের হলাম তখন আমি নতুন মানুষ। কাপড়-পরে স্নানাগারের ফি এক কাবুলি দারোয়ানের হাতে দিয়ে আর এক কাবুলি তাকে বকশিস দিলাম এবং বলাম "ফের তিন রোজ বাদ আসব। হাম মুসলমান নেই, হিন্দুস্থানকা

বাঙালী হিন্দু।” দারোয়ান আমার মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

যতদিন কাবুলে ছিলাম, প্রত্যেক তিন দিন অন্তর স্নান করতে যেতাম। দারোয়ান আমার ধর্ম সম্বন্ধে আর কখনও প্রশ্ন করেনি। তাকে আর বকশিসও দেই নি। একদিন একজন উচ্চশ্রেণীর অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম “হিন্দুদের দিনে স্নান করতে দেওয়া হয় না কেন?”

তিনি বললেন, আপনাকে কি দিনে স্নান করতে দেয় নি?

—আমাকে দেবে না কেন, স্থানীয় হিন্দুদের কথা বলছি।

—ওদের কথা বলবেন না, ওরা নিজেরাই এজন্য দায়ী। গেলেই হয়, কেউ বাধা দেয় না। কিন্তু এরা এত ভীরু এবং কাপুরুষ যে কিছু বলবার পূর্বেই সরে পড়ে। এজন্যই এদের এই দুর্দশা।

স্নান করে বাইরে এসে নিকটস্থ একটি চায়ের দোকানে প্রবেশ করলাম। এই দোকানে “সবজ্ চা” বিক্রি হয়। চায়ের এতই পিপাসা হয়েছিল যে চার পেয়ালা চা খাবার পর চায়ের পিপাসা মিটেছিল। দোকানি এবং অন্যান্য লোক আমার দেশ কোথায় জিজ্ঞাসা করল। যখন শুনল আমি কলকাতা হতে কাবুলে সাইকেলে করে এসেছি, তখন তারা প্রত্যেকেই আমার করমর্দন করল। এদের কথা শুনে মনে হল, বাংলা দেশে কোন ধর্মে প্রভাব নেই, আছে শুধু তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্রের প্রভাব। একজন বললে “বাঙালীরা যাদুশক্তির প্রভাবে বাঘকে কুকুর বানিয়ে রাখে।” এদের এই রকমের আজগুবি কথার প্রতিবাদ করে লাভ হবে না জানতাম—সেজন্য কিছুই বলিনি।

মন্দিরে ফিরে না এসে ফের সেই বড় চায়ের দোকানে গেলাম। বয় ছিল না—একজন শিখ তখন বয়ের কাজ করছিলেন। তিনি খোলাখুলিভাবেই আমাকে জানালেন, যদিও তিনি ভারতবাসী, তবু বৃটিশের প্রজা নন, তিনি সোভিয়েটের সভ্য। এখানেই থাকেন, তবে স্বেচ্ছায়ই তিনি এ দোকানে এসে কাজ করেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্বন্ধে আপাততঃ কিছুই বললেন না, ভবিষ্যতে জানাবেন আশ্বাস দিলেন। আমি চা খেয়ে বৈদেশিক সচিবের বাড়ির দিকে রওনা হলাম। ইচ্ছা, আফগানিস্থানের বৈদেশিক সচিবের সংগে সাক্ষাৎ করা। চায়ের দোকান হতে বৈদেশিক সচিবের বাড়ি বেশিদূরে ছিল না। কাবুল হোটেলের পাশেই তাঁর আফিস।

বৈদেশিক সচিবের বাড়ির সামনে কোন পুলিশ তো ছিলই না, একটি দারোয়ানকেও দেখতে না পেয়ে সন্দেহ হয়, তবে কি এটা বৈদেশিক সচিবের বাসভবন নয়। হয়তো আমি ভুল করেছি। কিন্তু ভুল করি নি ঠিক স্থানেই এসেছিলাম। বারান্দা পার হয়ে একটা দরজায় ধাক্কা দিতেই এক ভদ্রলোক ফরাসি ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই। আমি হিন্দুস্থানিতে বললাম, বৈদেশিক সচিবের সংগে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। একথা শুনেই তিনি আমাকে বসতে দিয়ে বৈদেশিক সচিবকে খবর দিতে গেলেন। বসে বসে ভাবছিলাম, স্বাধীন দেশের ধরণেই আলাদা। এত বড় একজন অফিসার অথচ তাঁর অফিস, তাঁর বাড়ি-ঘর দেখলে মনে হয় যেন একজন অতি সাধারণ লোক এখানে বাস করেন। যারা গৌরী সেনের টাকায় কাজ চালায় তারাই নবাবী চালে চলে।

বৈদেশিক সচিব তখনই নিজে বাইরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "কি চাই?"

—আপনার অটোগ্রাফ।

—আপনি কে?

—আমি একজন ভূ-পর্যটক।

—আমি ভূ-পর্যটকদের অটোগ্রাফ দিই না।

—আপনাকে ধন্যবাদ। বলতে পারেন এখানকার প্রধান মন্ত্রী থাকেন কোথায়?

—বহু দূরে।

—তবুও কত দূর ?

—তা আমি জানি না।

এই বলেই তিনি বিদায় নিলেন। বৈদেশিক সচিবের উক্তিতে একটুও দুঃখ হই নি, জানতাম এখানকার বৈদেশিক সচিব প্রধান মন্ত্রীর আজ্ঞাবাহী ভৃত্য মাত্র। তবুও অবনত মস্তকে যখন মন্দিরে ফিরে যাচ্ছিলাম তখন কাবুল হোটেলের বয় ডেকে বললে, ওপরে একজন হিন্দু আমাকে ডাকছেন। হোটেলের ওপর উঠবার সময় হোটেলের জাঁকজমক লক্ষ্য করলাম। দারোয়ানকে কোন মতেই বুঝতে দিই নি আমি এসব লক্ষ্য করছি।

দুদিকে সারি দিয়ে বড় বড় রুম। ঠিক মধ্যস্থল দিয়ে পথ। ঘরের দোতলায় কাঠের মেঝে কিন্তু বেশ পরিষ্কার, তারই ওপর দামী কারপেট বিছানো। কারপেটে নানারূপ ফুল আঁকা। এই বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত কার্পেটের সৌন্দর্য অবলোকন করে এই কথাটাই আমার মনে জাগল যে দরিদ্র শিল্পীর অক্লান্ত পরিশ্রমে এটি নির্মিত হয়েছে সে তার মজুরি ঠিকমত পায়নি। ফুলদানিটিও বেশ পরিপাটি করে সাজানো। বেশি আর লক্ষ্য করতে পারলাম না, একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বাইরে এসে আমার করমর্দন করে তাঁদের রুমের ভেতর নিয়ে চললেন।

"আপনি নিশ্চয়ই ভারতবাসী। মাথায় আপনার শোলার হ্যাট, পরনে ইউরোপীয় পোশাক, আপনি বেপরোয়া হয়ে পথ চলছেন। পাঠানরা আপনাকে কিছুই বলছে না কিন্তু আমরা তা পারি না। মোটরে আসতেই আমাদের বিপদ হয়েছিল।" জিজ্ঞাসা করে জানলাম তাঁদের বিপদটা আর কিছুই নয়, মোটর ড্রাইভার একবার মোটর থামিয়ে জংগলে গিয়েছিল, ইত্যবসরে এক বন্দুকধারী পাঠান তার বন্দুক তাঁদের কাছে বিক্রি করতে চাইছিল। বন্দুক তাঁরা কিনেন নি, উপরন্তু বন্দুকবিক্রেতাকে ডাকাত, আফ্রিদী, গলাকাটা এসব মারাত্মক বিশেষণে ভূষিত করে বিদায় করে দিয়ে কোনো মতে পৈতৃক প্রাণ নিয়ে কাবুলে এসেছেন। তাদের বিপদের কথা শুনে বৈদেশিক সচিবের নিকট অপমানের গ্লানিটা অনেক

কমে গিয়েছিল। তাঁরা বলছিলেন জাপানী টিপ্ বাতি বিক্রয় করার জন্য এখানে এসে তাঁরা ফ্যাসাদে পড়েছেন। বৈষ্ণবধর্মের অনুশাসন অনুসারে শব্জী-ভোজীদের বন্দুক দেখাই অন্যায়, সুতরাং বন্দুক ক্রয়বিক্রয়ের কথা উচ্চারণ করলে বোধ হয় তাঁদের বৈষ্ণবী আর্ম-এক্টে পড়ে অনন্ত কালের জন্য নরকগামী হতে হবে। এসব বিপদে ফের পা দিতে তাঁরা নারাজ। সেজন্য প্রস্তাব করলেন, যদি আমার সুযোগ এবং সুবিধা হয় তবে আমার দ্বারাই টিপ্ বাতির কারবারটা এ যাত্রার মত সেরে নিয়ে চিরতরে তাঁরা কাবুল শহরকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেবেন। তাঁদের ক্লীবসুলভ দীন ভাব দেখে আমার দয়া হল। বললাম কাল সকালে এসেই তাঁদের কাজ যাতে কালই শেষ হয় তার বন্দোবস্ত করব। পর দিন তাঁদের কাজ করে দিয়েছিলাম এবং সেই কাজের মজুরী স্বরূপ তাঁরা আমাকে কাবুল হোটেলেই মুরগীর মাংস এবং পোলাও খাইয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা কোনরূপে মাংস দিয়ে আমাকে ভোজন করাতে রাজি ছিলেন না। আমিও শাকসব্জী দিয়ে উদর পূর্তি করতে নারাজ ছিলাম। দায়ে পড়লে অনেকেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কাজ করতে বাধ্য হয়। শাক-ভোজী মহাশয়দের কন্যাদায় ছিল না, ছিল ব্যাবসাদায়। তা হতে এ যাত্রার মত আমার সাহায্যে রক্ষা পাওয়ায় মাংস দিয়ে ভোজন করাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এদের কাজকর্ম সম্পন্ন করে দিয়ে পরের দিন বেলা তিনটার সময় প্রধান মন্ত্রীর বাড়ির দিকে রওনা হলাম। অবশ্য এর পূর্বে চায়ের দোকানে পূর্বপরিচিত বয়ের কাছ হতে প্রধান মন্ত্রীর বাড়ির অনেক কথাই জেনে নিয়েছিলাম।

পথের উপর বরফ জমে পাথর হয়ে রয়েছিল। ঠাণ্ডা বাতাস প্রবল বেগে বইছিল। পথে গরিব লোক ছাড়া আর কেউ চলছিল না। দু'পাশের বাড়ির দরজাগুলি বন্ধ ছিল। নীরবে পথ চলছিলাম। প্রধান মন্ত্রী আমার সংগে কথা বলবেন কি না, সে কথা ভাবছিলাম না। অনেক বড় লোকই সময়ের অভাবে কথা বলেন নি, এখনও অনেকে দেখা করতে গেলে প্রথমেই ভাবেন হয়তো ভিক্ষা

চাইতে গিয়েছি। পর্যটকের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে দুনিয়ায় মানুষ আজও হয়ত কুণ্ঠিত কিন্তু এমন দিন নিশ্চয়ই আসবে যখন পৃথিবীর সংস্কৃতির ভাণ্ডারে তাদের অবদান যোগ্য-সমাদর লাভ করবে।

পথ চলার সময় হঠাৎ চোখের জ্যোতি কমে আসছিল। অন্ধ হয়ে যাচ্ছি বলে মনে হচ্ছিল। ভ্রমণ বোধ হয় এখানেই শেষ হতে চলল। মহা বিপদ। যারা ঈশ্বর আছে বলে কিছু বিশ্বাস করে তারা বেশ সুখী বলেই তখন মনে হল। তারা হয়তো এ অবস্থায় পড়ে ঈশ্বরের নাম নিয়ে কান্না জুড়ে দিত। কিন্তু আমার সে পথও বন্ধ। মাথার মাঝে চিন্তা-স্রোত বইছিল। সেই চিন্তাধারার গতি যে কত দ্রুত তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। ভাবছিলাম কি করে শরীরটাকে ধ্বংস করে এই দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। হঠাৎ মনে হল সংগে কিছু বিষাক্ত দ্রব্য বা প্রাণঘাতী অস্ত্র থাকলে হয়তো বা তখনকার মনের অবস্থায় ভবলীলা সাংগ হতে দেরী হত না। কিন্তু হঠাৎ অন্ধ হয়ে যাবার কারণ কি? কেন চোখে দেখতে পাচ্ছি না? শীতের জন্য নয়তো? সেদিন তাপমান যন্ত্রে উত্তাপ-শূন্য ডিগ্রী হতে সতেরো ডিগ্রী নীচে নেমে গিয়েছিল। মনে হল প্রবল ঠাণ্ডাই চোখের জ্যোতি লোপ হবার একমাত্র কারণ। চোখ দুটাকে গরম করার জন্য দু'হাতে রগড়িয়ে দিলাম। তারপর হাতের তেলা দুটোকে ঘসে গরম করে চোখে বার-বার লাগালাম। একটু একটু করে যদিও দৃষ্টি ফিরে আসছিল কিন্তু এদিকে পা দুখানা অবশ হয়ে যাচ্ছিল। এরূপভাবে পা ঠাণ্ডা হয়ে অবশ হতে শুরু হলেই মনে করতে হবে মৃত্যু আসন্ন। ক্ষীণপ্রভ চক্ষুদুটি মেলে তাকালাম। সব কিছুই ঝাপসা দেখাচ্ছিল, মনে হল প্রায় কুড়ি হাত দূরে একটি চায়ের দোকান রয়েছে। এই দোকানে যেতে পারলেই আমার প্রাণ বাঁচবে। পা কিন্তু নড়ছিল না। তখন চিৎকার করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। চিৎকার ক'রে লোক ডাকছিলাম। চিৎকার শুনে চায়ের দোকান হতে কয়েকজন পাঠান বেরিয়ে এসে আমাকে চায়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে পায়ের জুতা খুলে ফেলে বরফ

দিয়ে পা ঘসে দিল। কিছুক্ষণ ধলাই-মলাই করার পর পা দুটাতে শক্তি ফিরে এল। তারপর তারা উপর্যুপরি কয়েক পেয়ালা চা খাওয়ালে। চা খেয়ে শরীরে শক্তি এল, চোখের দৃষ্টি ভাল করেই ফিরে পেলাম। অবশেষে পা দুটোকে আগুনের কাছে রেখে চুপ করে বসে রইলাম এবং প্রায় এক ঘণ্টা পর সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করলাম। তখন আমার মনে যে কি আনন্দ! যে সকল পাঠান আমাকে সাহায্য করেছিল এবং যতগুলি পাঠান ঘরে বসে ছিল, তাদের প্রত্যেককে চা-এর নিমন্ত্রণ করলাম। দোকানী প্রত্যেককে চা দিল। প্রত্যেক পাঠান আমার ব্যবহারে খুশী হল। একজন বলল "আপনাকে আমরা সাহায্য করেছি, কর্তব্যের খাতিরে। আমরা সবাই খোদার বান্দা, খোদারই অনুগ্রহে আজ আপনি বেঁচে গেছেন। খোদার দয়ায় আমরা এখানে না থাকলে আপনার মৃত্যু অনিবার্য ছিল।

আমি লোকটির কথার জবাবে শুধু বললাম, আপনাদেরই অনুগ্রহ।

প্রচুর পরিমাণে চা খেয়ে পাঠানদের শরীর বেশ গরম হয়েছিল, সেজন্যই বোধহয় গল্পও জমে উঠেছিল বেশ। গল্প নানা রকমের। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র সবাই এই গল্পস্রোতে ভেসে যাচ্ছিলেন। আমিও বাচ্চা-ই-সাক্কোকে সেই গল্পস্রোতে ভাসাতে চেষ্টা করলাম। আমার চেষ্টা সফল হল, তার একটি কারণ ছিল। এই পাঠানগুলি আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিল। পাঠানরা সকল সময়ই কতকগুলি নিজস্ব নিয়ম মেনে চলে। নানা পরিবর্তনের মাঝেও তারা ঐ নিয়মগুলি পালন করে আসছে। যার প্রাণরক্ষা করা হয় তার সামনে কোনও গোপনীয় কথা প্রকাশ করলেও উভয় পক্ষেরই কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। প্রাণরক্ষকের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কেউ দাঁড়ায় নি। ইহাই আফগান হিন্দু এবং মুস্লিমদের একটা মস্ত জাতীয় বৈশিষ্ট্য। বাচ্চা-ই-সাক্কোর সম্বন্ধে এদের কাছ হতে যা শুনেছিলাম তা কখনও আফগানিস্থানে থাকার সময় কারো কাছে বলিনি। আজও আমার ভ্রমণ-কাহিনীতে এই ঘটনাটি স্থান পেত না, কিন্তু আফগানিস্থান এমনই এক স্তরে আজ পৌঁছেছে যদি আমি যা শুনেছিলাম এখন তা' প্রকাশ করি

তবে আমার প্রাণরক্ষকদের কোন ক্ষতি হবে না। তারপর এটাও মনে রাখতে হবে, যা' বলতে যাচ্ছি তা চায়ের দোকানের গল্প।

মানুষ মানুষে ভেদ ঘুচিয়ে দেবার জন্য যিশু ক্রুশবিদ্ধ হলেন, বুদ্ধ এত ত্যাগ স্বীকার করলেন, নানক সকল ধর্ম মিলিয়ে নতুন ধর্ম তৈরী করলেন, কিন্তু মানুষ সমান স্তরে এল না। মানুষের মধ্যে ছোটজাত বড়জাত রয়ে গেল, ছোটলোক বড়লোকের তারতম্য রয়ে গেল। বাচ্চা-ই-সাক্কো ছোট জাত। তাঁর অভ্যুদয়ের দরকার ছিল। যখন দেখা গেল বাচ্চা-ই-সাক্কো হবিব উল্লা হয়ে আর্থিক জগতে পুঁজিবাদী এবং উঁচুজাতের উপর টেক্কা দিয়েছে তখনই আবার উঁচুজাতের মাথা ঘুলিয়ে গেল, নাদির সাহের দরকার হল।

বাচ্চা-ই-সাক্কো মাত্র আট মাস রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্ব-সময়ে আফগানিস্থানের কি অবস্থা ছিল সেই সম্বন্ধে কেউ কিছু বলেন নি। আমি পর্যটক মাত্র। ঐতিহাসিক জ্ঞান অর্জন করবার জন্য সে দেশে যাই নি। সে দেশের লোকও বাচ্চা-ই-সাক্কোর সম্বন্ধে তখন অনেকটা নীরব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গোপনে যারা বাচ্চা-ই-সাক্কোর সম্বন্ধে কথা বলত তাদের কথা শুনতে আমার বেশ ভাল লাগত। যারা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, বাচ্চা-ই-সাক্কো এদেরই সমশ্রেণীর লোক। কুহীস্থান নামক যায়গা হতে এরা কাবুলে এসে বসবাস করছে। কুহীস্থানই বাচ্চা-ই-সাক্কোর জন্মস্থান। বাচ্চা-ই-সাক্কো হিলজাই সম্প্রদায়ের লোক।

কাংড়া জেলা নিবাসী চেলারাম গত মহাযুদ্ধের চাকুরি শেষ করে, তৃতীয় আফগান যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। আফগান যুদ্ধ শেষ হলে তাঁকে চাকরি ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। বাড়িতে এসে বেশি দিন নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারেন নি। আফগানিস্থানে চাকরির অন্বেষণে যান। আফগানিস্থানে যাবার পর তাঁর মতিগতি ভাল ছিল না। কোনও কারণবশত তাঁকে জেলে যেতে হয়। তখন আমান উল্লার রাজত্ব কাল বলেই চেলারাম

বিকালা'ঃ না হয়েই জেলে গিয়েছিলেন। আজও আফগানিস্থানে চোরের হাত কেটে ফেলা হয়।

আমান উল্লা সমাজ-সংস্কারে মন দিয়েছিলেন। জেল-সংস্কার করবার তাঁর ফুরসত হয় নি। তখন জেলে গেলে কয়েদীদের বাইরে থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে আনতে হত। এখনও বোধ হয় সেই নিয়মই আছে তবে গত কয়েক বৎসরের সংবাদ আমি সঠিক জানি না। চেলারামও বাইরে থেকেই খাবার সংগ্রহ করতেন। একদিকে জেলের খাটুনি তারপর খাদ্য সংগ্রহ করে আনা ভয়ানক পরিশ্রমের কাজ। বেশি পরিশ্রম করলে সুনিদ্রা হয়। একদিন সকালবেলা চেলারাম যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মাথার টিকি দেখে, তিনি যে হিন্দু সকলেই বুঝতে পেরেছিল। হিন্দুরা খুব কমই জেলে যায়। সেজন্যই বোধহয় হিন্দুদের জেলে দেখলে অন্যান্য কয়েদীরা সকলে মিলে তাদের উপর অনর্থক অত্যাচার করে। চেলারামকেও অনর্থক নাজেহাল করার জন্য অন্যান্য কয়েদীরা একজোট হল। চেলারাম বুঝলেন এবার তাঁর প্রাণান্ত হবে। যখন তাঁর উপর সত্যই অত্যাচার শুরু হল তখন কাছে দণ্ডায়মান এক গম্ভীর প্রকৃতির লোকের পায়ে ধরে চেলারাম প্রাণভিক্ষা চাইলেন। সেই লোকটিই বাচ্চা-ই-সাক্কো। যার কথায় এতগুলি লোক এক জন হিন্দু কয়েদীকে হত্যা করল না তাঁর নিশ্চয়ই বিশেষত্ব ছিল। এখানে বিশেষত্ব শব্দ ব্যবহার করেছি নানা কারণে; ভারতের হিন্দু এক দিন বুঝতে পারবে এই বিশেষত্ব কি চিজ্।

চেলারামের মনের পরিবর্তন হয়ে গেল। চেলারাম বুঝলেন টাকাই পরমার্থ নয়। তারপর বিদ্রোহ হল। বিদ্রোহে বাচ্চা-ই-সাক্কো কৃতকার্য হয়ে হবিবুল্লা নাম নিলেন। কিন্তু তাঁরও মতিগতি বদলে গেল। চেলারাম ধর্মের গোঁড়ামি আফগানিস্থান হতে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হলেন। বাচ্চা-ই-সাক্কো ছোট-জাত বড়জাত এ দুটা কথা পৃথিবী হতে লোপ করতে উদ্যোগী হয়ে দেখলেন, এ যাবার নয়, যে পর্যন্ত রুশ দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা না যায়। চেলারাম এবং

বাচ্চা-ই-সাক্কো উভয়ে একমত হয়ে এ কাজে ব্রতী হলেন, কিন্তু পেরে উঠলেন না। নাদীর শা এসে তাঁদের সোনার সংসারে আগুন ধরিয়ে দিলেন। চেলারাম পালালেন। বাচ্চ-ই-সাক্কোকে ফাঁসি দেওয়া হল। ছোটলোকের রাজত্ব আট মাসের মাঝেই শেষ হল। ইউরোপীয় লেখকগণ বলেছেন বাচ্চা-ই-সাক্কো উত্তর হতে এসে কাবুল আক্রমণ করেছিলেন। আমি শুনেছি বাচ্চা-ই-সাক্কো জেল থেকে বের হয়ে বিদ্রোহ করেন।

রাজা হবিবুল্লা ওরফে বাচ্চা-ই-সাক্কো

বিদ্রোহ সম্বন্ধেও অনেক কথা শোনা যায়। কাবুলীরা প্রকাশ্যেই বলত পাঞ্জাবী মুসলমান, বেলুচি এবং আফ্রিদী সেপাই যদি বাচ্চাকে সাহায্য না করত

তবে বাচ্চা যুদ্ধে জয়ী হতে পারতেন না। বৃটিশ কি অন্য কোনও সরকার (সঠিক কথা বলতে কেহই প্রস্তুত ছিলেন না) বিদেশী লোককে পূর্ব হতেই রেখে ছিলেন যুদ্ধ করতে। বিদেশী লোক বাচ্চাকে সর্বদিক দিয়ে সাহায্য করার জন্য বাচ্চা বিজয়ী হতে পেরেছিলেন। আবার যখন নাদির সাহ বিদেশ হতে এসে
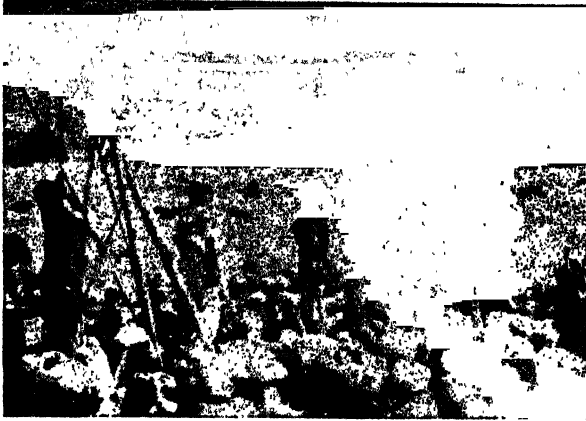
ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলায়মান বাচ্চা-ই-সাক্কো এবং তাঁর দুইজন সহকারী

কাবুল আক্রমণ করেছিলেন তখনও বিদেশী সৈন্য নাদির সাহকে সাহায্য করেছিলেন—এই তথ্য সর্বজন জ্ঞাত। বিদেশী সৈন্য বলতে বৃটিশ অথবা রুশ সৈন্য নয়—ভারতীয় খুফতি সৈন্য। সেই সময়ে চীনাদের সাসনড়ে এবং অন্যান্য স্থানে ভারতীয় মুফতী সৈন্যের বেশ প্রসার ছিল।

বাচ্চা-ই-সাক্কোর কাহিনী শ্রবণ করে মন্দিরে আসতে হল, কারণ সন্ধ্যার পর আর প্রধান মন্ত্রীর বাড়ী যাওয়া চলে না এবং এত শীতের মাঝে পথে চলাও সমচান নয়। আমামাই মন্দিরে ফিরে গিয়ে পূজারীকে সেদিনকার বিপদের কথা বলাতে পূজারী খুসি এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন "প্রাণটা তাহলে রক্ষা পেল

এবারের মত। পাঠানরা কিন্তু হিন্দুদের মোটেই সাহায্য করে না।" পূজারীর কথা শুনে মনে মনে বেশ একটু হাসলাম।

সাহায্য না করারই কথা। অতীতযুগ হতে এদেশের নীচ জাতের প্রতি এরাই অর্থাৎ তথাকথিত অভিজাতরাই অত্যাচার করেছে বেশি। ধর্মের দিক দিয়েও কত পরিবর্তনের ঢেউ এসেছে তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এদের প্রতিপত্তির অবসান হয়নি, গরিবের উপর অত্যাচারের উপশম হয় নি। এখানে আমি হিন্দু মুসলমানের কথা ভুলেই গিয়াছিলাম। আমি এখন ভাবছিলাম অত্যাচারী এবং অত্যাচারিতদের কথা।

লক্ষ্মীর কথা

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ইচ্ছা হল একবার স্থানীয় সব্জি মণ্ডি দেখে আসি। উদ্দেশ্য সেখানে মাছ কি দরে বিক্রি হয় তা দেখব। যদি মাছ কিনতে পাই তবে কোন পাঠানের দোকানে নিয়ে তা' ভেজে দিতে বলব এবং আরাম করে খাব। মাছ ভাজা খাবার প্রবল ইচ্ছাই আমাকে সব্জি মণ্ডির দিকে টেনে নিয়ে গেল।

সব্জি মণ্ডির বাইরে একস্থানে জন কতক লোক কতকগুলি মাছ বিক্রি করছিল। মাছগুলি দেখতে বড়ই কুৎসিত। তখন সমাজতন্ত্রের কথা ভাবছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি কারণে বলতে পারি না আপনা হতেই মুখ দিয়ে গুণ গুণ স্বরে একটি গানের কলি বের হয়ে এল। সেটি হল 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।' হঠাৎ নজরে পড়ল, অদূরে বোরখা পরিহিত একজন নারী চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালেন। সেখান হতে তিনি ইসারায় আমাকে ডাকলেন। আমি নিকটে গেলে বোরখার ভেতর হতেই তিনি পরিষ্কার বাংলা ভাষায় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আফগানিস্থানে কাবুল শহরের বুকে পরিষ্কার বাঙলাভাষায় একটি নারীকে কথা বলতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হলাম। তাঁর কথা শুনে তাঁকে বাঙালী ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হল। তিনি আমাকে যতগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার সকল কথারই উত্তর দিলাম। আমার কথা শুনে তিনি ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন, তারপর বলেলন তিনিও বাঙালী। কাবুলের মত স্থানে একজন বাঙালীর সংগে সাক্ষাৎ হওয়ায় সুখী হয়েছেন। ঘটনাচক্রে কাবুলেই তিনি বাস করেন। বাড়িতে তাঁর স্বামী এবং ছেলেমেয়ে রয়েছেন। আমাকে তিনি তাঁরই সংগে তাঁর বাড়ীতে যেতে বললেন। আফগানি-স্থানে অনাত্মীয় স্ত্রীলোকের পেছনে চলা বড়ই অন্যায় কাজ। আমার মনে কোন

অসদভিপ্রায় ছিলনা। কাবুলের মত স্থানে একটি বাঙালী নারীর দর্শন পেয়ে তাঁর সম্বন্ধে জানবার কৌতুহল হয়েছিল। কোনরূপ চিন্তা না করেই তাঁর কথায় সম্মত হলাম। তিমি আগে চললেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনটি সরু গলি ঘুরে আমরা একটি বাড়ীর সামনে এলাম। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। একটি বার তের বৎসরের মেয়ে ও একটি আট বৎসরের ছেলে বের হয়ে এল। তাদের মায়ের সংগে একজন অপরিচিত লোককে দেখে তারা বিস্মিত হল। তাদের মা তাদের ডেকে কি যেন বল্লেন। তখন তারা একটু ভয়ে ভয়ে সংগে চলল।

উপরে উঠে গিয়ে দেখলাম, একজন পাঠান বসে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি সুখী হয়েছেন বলে মনে হল না। যা' হোক তিনি ভদ্রতা প্রকাশ করতে কসুর করেন নি। "স্তারেমাসে" বলে সম্ভাষণ করলেন। উত্তরে আমি নমস্কার বলাতে তিনি কিছু বিস্মিত হলেন। তারপর তিনি হিন্দুস্থানীতে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আমি ও হিন্দুস্থানীতে তাঁর কথার জবাব দিলাম। আমার পরিচয় পেয়ে এবং আমি যে একজন "সাইয়া তুনিয়া" শুনে তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি আমাকে একটি নতুন টি-পট, এক ঘটি গরম জল এবং কতকগুলি চায়ের পাতা সামনে এনে দিয়ে চা বানিয়ে খেতে বললেন। হেসে বললাল "নতুন টি পটের কোন দরকার ছিল না। আমি হিন্দুকুলে জন্মেছি বটে, তা বলে হিন্দুদের সনাতন আচার বিচার মানতে কোন মতেই রাজি নই। ছুতমার্গ আমার ত্রিসীমানায় নেই।" আমার কথা শুনে সরল-চিত্ত পাঠান অত্যন্ত খুশী হলেন এবং তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে আমার করমর্দন করলেন। বাঙালীরা দুধ ছাড়া চা খায় না, সে জন্য তিনি তাঁর স্ত্রীকে দুধ আনতে পাঠিয়ে ছিলেন। কথায় কথায় বললেন, মেওয়া বিক্রি করবার জন্যে বহুকাল যাবৎ প্রত্যেক বৎসরই বাঙলাদেশে যাওয়া তাঁর অভ্যাস। আঠার বৎসর পূর্বে তিনি লক্ষীকে কলকাতায় বিয়ে করেছিলেন। লক্ষী বাঙালীর মেয়ে, তিনি লক্ষীকে

চুরি করে আনেন নি। হিন্দুমতে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। এ দুটিই তাঁদের ছেলে মেয়ে। তাঁর স্ত্রী বাঙালী বলে তিনি বাঙালীকে ভালবাসেন। সুজলা সুফলা বাঙলা দেশের একটি কোমল বধূ শুষ্ক কর্কশ পাঠানকে স্বামীত্বে বরণ করে তাঁর গৃহকে আপন করে নিয়েছে কথাটা ভাবতেও মনে বিস্ময় লাগছিল।

এটা হবার কথাই। ছোটবেলা থেকে আমরা মুসলিম বিদ্বেষী। হঠাৎ মুসলিম প্রেম জেগে উঠবে কোথা হতে এটাই বোধহয় পাঠান মহাশয়ের মনে ছিল কিন্তু আমি যে পৃথিবীকে আমার করে নিয়েছিলাম তা কারো মনে জাগতে পারে না, কারণ এখনও পৃথিবীর নরনারী নিজের ইচ্ছা মত কিছুই করতেও পারে না।

ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে নিয়ে এলাম। এবার তাদের একটু সাহস হয়েছে। তারা ভয় না করে আমার কাছে এল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের সংগে আমি কথা বলতে পারি নি। তারা জানত শুধু পোস্ত ভাষা। এ সময়ে লক্ষ্মী ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। এবার তাঁর পরনে খাঁটি বাঙালী মেয়ের পোষাক। তাঁর শাড়ি পরা দেখে আমার বেশ ভাল লাগল। দেখলাম পাঠানের চোখেমুখেও হাসি ফুটে উঠেছে।

এবার পাঠান-স্বামী লক্ষ্মীর সংগে আমার পরিচয় করে দিলেন। তিনি ভাঙা ভাঙা বাঙলাতে স্ত্রীকে বললেন, ইনি তোমার দাদা, একে অভিবাদন কর। সত্যই লক্ষ্মী যখন বাঙালী মেয়ের মত আমার পায়ের কাছে প্রণাম করলেন তখন নিমিষে আমার মনে বাঙলা দেশের কল্যাণমণ্ডিত গৃহচ্ছবি ভেসে উঠল। লক্ষ্মীর মধ্যে য়েন সমস্ত বাঙলাদেশ মূর্ত হয়ে উঠল। লক্ষ্মী আমার জন্য চা প্রস্তুত করবেন কি না ইতস্তত করছেন দেখে তাঁর পাঠান স্বামী হেসে উঠলেন। তিনি তাকে আশ্বাস দিয়ে চা বানাতে বললেন। লক্ষ্মী যত্ন সহকারে চা বানিয়ে রুটির সংগে চা দিলেন। তারপর তাঁর নিজের কথা বলতে লাগলেন।

লক্ষ্মীর সংগে বাংলাতেই কথা বলছিলাম। পাঠানকে বললাম, "ভাই বাঙালী বোনের সংগে আমি নিজের ভাষায়ই কথা বলব এতে তুমি নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে

না।" পাঠান বললেন "তুমি বাঙলাতে কথা বল এতে আমার আপত্তি নেই। আমি বাঙলা একটু আধটু বলতে পারি। কিন্তু তোমার বোন আমাকে ভাল করে বাঙলা শেখায় নি সেজন্য আমি দুঃখিত। যখনই আমি কলকাতা যাই তখনই অনেক চেষ্টা করে তোমার বোনের জন্য বাঙলা কেতাব কিনে আনি। তুমি ইচ্ছা করলে এসব কেতাব দেখতে পার।"

কথা বলতে বলতে লক্ষ্মী তাঁর পুস্তকের ভাণ্ডার আমার সামনে ধরলেন। দেখলাম কাশীদাসের মহাভারত, টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী, সুরথ-উদ্ধার গীতাভিনয়, বংকিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর, যুগলাঙ্গুরীয়, আনন্দমঠ, বিষবৃক্ষ, লোকরহস্য, পুরাতন কএকখানা প্রবাসী এবং নব্য ভারত রয়েছে। বইগুলি দেখে মনে বেশ আনন্দ হল। বুঝতে পারলাম যদিও পাঠানের বহিরবয়ব কর্কশ তবু অন্তর কোমল। লক্ষ্মীকে তিনি প্রকৃতপক্ষেই অন্তরের সহিত ভালবাসেন। লক্ষ্মীকে সুখী রাখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করে থাকেন।

লক্ষ্য করলাম, লক্ষ্মীর মনে প্রথমেই ছুৎমার্গের ভাব এসেছিল। তিনি যদিও পাঠানকে বিয়ে করেছেন তবুও তিনি মনে প্রাণে হিন্দুই আছেন। আজও তিনি অখাদ্য কিছুই খান নি। নিজেই পাঁঠা অথবা দুম্বার মাংস কিনে আনেন। মাছ যা পাওয়া যায় তার দাম বেশ সস্তা।

মাছের কথা শুনতেই আপনা থেকেই মুখে জল এল। লক্ষ্মী বললেন এক দিন মাছ রেঁধে আমাকে খাওয়াবেন। কিন্তু তত সময় অপেক্ষা করা আমার সহ্য হল না। বললাম, পরের কথা পরে হবে, এখন ঘরে যা আছে তা দিলেই খুশী হব।

আমার কথা শুনে লক্ষ্মী হেসে ফেললেন এবং পাঠানকে কি বলে বাইরে চলে গেলেন। লক্ষ্মী বাইরে চলে গেলে পাঠান বললেন স্থানীয় ইলেকট্রিক কোম্পানীতে একজন বাঙালী সাহেব কাজ করেন, তাঁকে অনেক দিন নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, কিন্তু তিনি কখনও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নি। লক্ষ্মী বাঙালীর সংগ পছন্দ করে, আমিও বাঙালীর সংগে মেলামেশা করতে চাই, কারণ এতে আমার

ইজ্জত বাড়ে। কিন্তু ঐ ছোটলোক একদিনও আমার বাড়ী আসে নি। তুমি এসেছ, বড়ই সুখী হয়েছি। 'পাঠানকে জানিয়ে দিলাম, যে কোন দিন আমাকে খেতে ডাকবেন সেদিনই আমি আসব।

আমার কথা শুনে পাঠান বড়ই সুখী হলেন এবং পরের দিন তাঁর বাড়িতে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। ইতিমধ্যে লক্ষ্মী থালায় ভাত এবং বাটিতে তরকারী সাজিয়ে নিয়ে এলেন। ছোলার ডাল, পাঁঠার মাংসের ঝোল এবং প্রচুর আচার ছিল। বহুদিন পরে বাঙালী বোনের দেওয়া ডাল-ভাত খেয়ে তৃপ্ত হলাম।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই ভগ্নীপতির মুখদর্শন হল। মুখ হাত ধুয়েই তাঁর সংগে চললাম। পথে চলতে চলতে কলকাতার সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের কথা বলে আমার মনে কলকাতার একটি চিত্র এঁকে তুলে ধরলেন। বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দেখি লক্ষ্মী এবং ছেলেমেয়ে দুটি বাজারে যাবার জন্য কাপড় পরে প্রস্তুত হয়েছে। আমাকে চা রুটি দিয়েই তারা বাজারে যাবে ঠিক করেছিল। আমি কিন্তু তাতে রাজী হলাম না। ওদের সংগে বাজারে যেতে আমারও ইচ্ছা হল। পাঠানদের নিয়ম কিন্তু অন্য রকমের। অতিথিকে বাজারে গিয়ে কিছু কিনে আনতে নেই। আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললাম, আমিও বাজারে যাব এবং আমার যা ভাল লাগে তা কিনতে বলব। তিনি হেসে সম্মতি দিয়ে বললেন, ভাই বোন এক সংগে বাজারে যাবে তাতে আপত্তি কি ?

লক্ষ্মীর ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাজারে গেলাম। পথে লক্ষ্মীকে বললাম, বাজারে গিয়ে আমার এক পয়সাও খরচ করা পাঠানদের মতে মাহাপাপ। কিন্তু বোনকে যদি আমি আমার ইচ্ছামত কিছু কিনে দিই, তাতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে ? আমার দুটি বোন ছিল তাঁরা মারা গেছেন। আজ থেকে তুমিই আমার বোন। তোমাকে এবং তোমার ছেলেমেয়েকে কিছু কিনে দিলে শান্তি পাব। লক্ষ্মী তাতে কোন আপত্তি করলেন না। প্রথমত আমি ছেলেমেয়ে দুটিকে কিছু

খেলন, কিনে উপহার দিলাম। মামার নিকট হতে উপহার পেয়ে তাদের বেশ আনন্দ হল। জংলী হাঁস এবং অন্যান্য কিছু আহার্য কিনে আনলাম।

লক্ষ্মীর সংগে আমাকে বাজারে দেখে অনেকেই কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। লক্ষ্মী তা বুঝতে পেরে ছেলে-মেয়ের কানে কি বলে দিলেন। লক্ষ্মীর ছেলে-মেয়ে মার কথা শুনে আমাকে পোস্ত ভাষায় মামা বলে ডাকছিল। পথের লোক অনেকেই আমার কথা ছেলেমেয়ে দুটিকে জিজ্ঞাসা করেছিল। ছেলেমেয়েরা বলেছিল "ইনি কলকাতার মামা।" এদের হাবভাব দেখে মনে হল, কলকাতার লোককে মামা বলে ডাকা অগৌরবের নয়।

বাড়ী ফিরে লক্ষ্মী রান্নার বন্দোবস্ত করলেন। রান্না করার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর কুমারী জীবনের কথা তিনি আমার কাছে বলে যাচ্ছিলেন। লক্ষ্মী নিজের কাহিনী যা বলেছিলেন তা এখানে বলছি। এই কাহিনীর পাত্রপাত্রীদের আসল নাম গোপন রেখে কাল্পনিক নামই ব্যবহার করব।

পূর্ববংগের কোন এক জেলায় লক্ষ্মীর পিত্রালয় ছিল। পিতা হরিশংকর রায় সদরে চাকুরি করতেন। হরিশংকরের মাইনে সামান্যই ছিল। সেজন্যই বোধ হয় স্ত্রীকে চাকুরি-স্থানে রাখতে সক্ষম হতেন না। স্ত্রী একা বাড়ীতেই থাকতেন। যখনই হরিশংকর সুযোগ পেতেন তখনই বাড়ী এসে সংসার দেখাশুনা করতেন, তারপর আবার চলে যেতেন। তাঁদের গ্রামের ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব কালু পণ্ডিত লোক ভাল ছিলেন না। তিনি দরিদ্র হরিশংকরের স্ত্রীর নামে নানা কুৎসা প্রচার করছিলেন। কিছুদিন পর হরিশংকরের স্ত্রী গর্ভবতী হলেন। যথাসময়ে লক্ষ্মীর জন্ম হল। তখন কালু পণ্ডিত গ্রামে হৈ চৈ শুরু করলেন। দরিদ্র হরিশংকর ধনী ব্রাহ্মণ কালু পণ্ডিতের চক্রান্তে একঘরে হলেন। কালু পণ্ডিতের কাছে অনেকেই টাকা ধার করত। সেজন্য ঋণগ্রস্ত গ্রামবাসী হরিশংকর প্রকৃতই দোষী কি না তার বিচার না করেই হরিশংকরকে সমাজচ্যুত করল।

দরিদ্র হরিশংকরের পক্ষে এটা বরদাস্ত করা সম্ভব হল না। তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং স্ত্রী ও কন্যার দায়িত্ব এড়াতে চেষ্টা করলেন। লক্ষ্মীর মা ছিলেন বুদ্ধিমতী। তিনি বুঝতে পারলেন প্রবল শত্রুর সংগে বিবাদ করে গ্রামে বাস করা অসম্ভব। তাই তিনি তাঁর এক দূরসম্পর্কিত ভগ্নীর কাছে কলিকাতায় চলে এলেন।

লক্ষ্মীর মা কলিকাতায় এলেন। কালু পণ্ডিত কিন্তু তার সংগ ছাড়ল না। সে নানা চেষ্টা করে লক্ষ্মীর মার ঠিকানা বের করল এবং কলকাতায় চলে এল। যখনই সে সুযোগ পেত তখনই লক্ষ্মীর মার নিকট উপস্থিত হত এবং তাঁর কাছে কুপ্রস্তাব করত। একদিন লক্ষ্মীর মার অসহ্য বোধ হওয়ায় তিনি ঝাঁটি দিয়ে তাকে আঘাত করেন। ক্ষমতা মদে মত্ত কালু পণ্ডিত চলে গেলে কিন্তু তার মনে জেগে রইল প্রতিশোধ কামনা।

একদিন লক্ষ্মীর মা লক্ষ্মীকে মুদির দোকানে ঘি কিনতে পাঠিয়েছিলেন। লক্ষ্মী আর ফিরে আসে নি। লক্ষ্মীর মা তাঁর সাধ্যমত খোঁজাখুঁজি করলেন কিন্তু তার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কিছুদিন পর তিনি সংবাদ পেলেন কালু পণ্ডিত লক্ষ্মীকে চুরি করে ঢাকাতে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। লক্ষ্মীর মা অতি কষ্টে ঢাকা গেলেন। সেখানে কালু পণ্ডিত এক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ীতে ছিল। ঘটনাচক্রে এক সহৃদয় মুসলমান ভদ্রলোকের সংগে লক্ষ্মীর মার পরিচয় হয়। তাঁর সাহায্যেই তিনি কালু পণ্ডিতের কবল থেকে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করেন। বহুদিন পর লক্ষ্মীর মা মেয়েকে ফিরে পেয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। এর কয়েক মাস পর কালু পণ্ডিত ইহধাম পরিত্যাগ করেন। গ্রামের লোক তার পরলোকগমনে সুখী হল বটে কিন্তু পর বৎসর কালু পণ্ডিতের দুর্দান্ত পুত্র অমলকৃষ্ণ গদিতে বসে অধিকতর প্রতাপে গ্রামের উপর আধিপত্য করতে লাগল।

দেখতে দেখতে বৎসরের পর বৎসর কেটে যাচ্ছিল। লক্ষ্মীর বিয়ের বয়স হল। লক্ষ্মীর মা বারংবার পত্রযোগে স্বামীকে খবর দিলেন কিন্তু কোন ফল হল

না। ঢাকার সেই মুসলমান ভদ্রলোককে লক্ষ্মীর মা দাদা বলে ডেকেছিলেন। এই পাতানো দাদাকে তিনি লক্ষ্মীর বিয়ের জন্য অনুরোধ করলেন। দাদা জানালেন তাঁর হাতে কলকাতায় একটি উপযুক্ত পাত্র আছে তাকে তিনি সংগে করে নিয়ে আসবেন। যথা সময়ে পাত্রকে সংগে করে মুসলমান ভদ্রলোকটি কলকাতায় উপস্থিত হলেন। পাত্রের চেহারা দেখে এবং ভাংগা কথা শুনে লক্ষ্মীর মায়ের সন্দেহ হল ভবিষ্যৎ জামাতা বাবাজী বাংগালী হিন্দু নয়। তাঁকে বলা হল যে পাত্র ছোট-বেলায় পেশোয়ারে ছিল। দুঃখিনীর মেয়ের বিয়ে, বেশি ভাবনা করার সময় ছিল না। হিন্দুমতে লক্ষ্মীর বিয়ে হয়ে গেল। পাত্র বললেন লক্ষ্মীকে নিয়ে তিনি ঢাকা যাচ্ছেন। কিন্তু ঢাকার পথ আর শেষ হয় না। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে পাঠানমুল্লুক কাবুলে এসে লক্ষ্মী প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করলেন।

এই পর্যন্ত বলেই লক্ষ্মী স্বামীকে উদ্দেশ করে বললেন, লোকটি কিন্তু খারাপ নয়। আমাকে বিশেষ জ্বালাযন্ত্রণা দেয় নি। তবে প্রথম কিছুদিন অনভ্যস্ত জীবন-যাত্রার সংগে আপোষ করতে বেগ পেতে হয়েছিল। কি যে নিদারুণ কষ্টে আমায় দিন গিয়েছে। তারপর যতই দিন যাচ্ছিল ততই অদৃষ্টকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছিলাম। এ দুটি ছেলেমেয়ে জন্মেছে এখন আমার বিশেষ কিছু কষ্ট নেই। কিন্তু এ দেশে থাকতে মোটেই আমার ইচ্ছা হয় না। আমরা কি দেশে গিয়ে হিন্দুসমাজে মেলা-মেশা করবার সুযোগ পাব ?

লক্ষ্মীর কথা শুনে স্থান কাল পাত্র ভুলে একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর প্রশ্নে চমক ভাঙল।

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ভিন্ন ভিন্ন তরকারি রান্না করে লক্ষ্মী আমাকে খেতে দিলেন কিন্তু আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা সবই দূর হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্মীর করুণ কাহিনী থেকে থেকে অন্তরে আঘাত করছিল। কোন রকমে খাওয়া শেষ করে সেদিনের মত বিদায় নিয়েছিলাম। তারপর যে কয়েকদিন কাবুলে ছিলাম

দুঃখিনী ভগ্নীকে ভুলি নি। কাবুল হতে বিদায় নেবার সময় লক্ষ্মীর পাঠান-স্বামী পথে খাবার জন্য অনেক রকম ফল দিয়ে গিয়েছিলেন।

সমাজের পাপে, সমাজপতিদের জঘন্য মনোবৃত্তির দরুণ বাংলার কত লক্ষ্মী যে এরূপভাবে দিন কাটাচ্ছেন—কে তার সংখ্যা গণনা করবে? কে তার জন্য দায়ী?

কাবুলে শীতের সকাল

সকালবেলা হতেই তুষারপাত শুরু হয়েছে। সারাদিন ঘরে বসেই কাটাতে হ'ল। তুষারপাতকে উপেক্ষা করেই জন কয়েক হিন্দু এবং মুসলমান আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে এলেন। ভ্রমণ-কাহিনী শোনার জন্য আসেন নি, তাঁরা এসেছিলেন আসামাই মন্দিরে ঘোল ঢালতে এবং আমার নিকট থেকে বসন্ত রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য কবচ নিতে। আগন্তুকদের ধারণা, আসামাই মন্দিরের কোনও বিশিষ্ট স্থানে ঘোল ঢাললেই বসন্ত রোগের হাত হতে রোগী বেঁচে যাবে। তাদের আরও ধারণা ছিল, যারা দেশ ভ্রমণ করে তারা কবচ তাবিজ দিয়ে থাকে। এদের ভুল বিশ্বাস ভাংতে গিয়ে আমাকে বড় রকমের একটা চোট সামলাতে হ'ল। পুজারী আমাকে বললেন, "আপনি দেখছি এখানে বসেই মন্দিরের অবমাননা করতে শুরু করেছেন। আসামাই জাগ্রত গংগা। শ্রীকৃষ্ণ এই গংগাজলকেই কলিযুগে মুক্তির হেতু বলে গিয়েছেন। এখানে ঘোল ঢেলে কত বসন্ত রোগী নিরাময় হয়েছে তার হিসাব রাখেন? আপনি হয়তো কবচ দেবার শক্তি অর্জন করেন নি, কিন্তু যারা কবচে বিশ্বাস করে তাদের বিভ্রান্ত করা আপনার পক্ষে অন্যায় এবং এরূপ করলে এখানে আপনি থাকতে পারবেন না।" আমি চুপ করে থেকে পুঁজিবাদী পরিচালিত অর্থনীতির কথা ভাবতেছিলাম এবং সুযোগ পেলে আজই এখান হতে সরে পড়ব, এটাও মনে ছিল।

বেলা তখন চারটা। আকাশ পরিষ্কার। প্রবল হাওয়া বইছিল। এসময়ে পথে কেউ বের হয় না, তবুও বের হলাম। শেষে প্রধান মন্ত্রীর বাড়ির সদর দরজায় উপস্থিত হলাম। দরজায় দুটি তুর্কীস্থানের পাঠান পাহারা দিচ্ছিল। এদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সদর দরজা পেরিয়ে গেলাম। মনে মনে শোলা-হেটটিকে ধন্যবাদ দিলাম। কোনও এক সময়ে ইউরোপীয়ানরা বোখারায় শোলা

হেট ব্যবহার করত। এসব ইউরোপীয়গণ সাধারণত কূট রাজনীতিক—কাজেই আসতেন। রাজার প্রাসাদে তাঁদের অবাধ যাতায়াত ছিল। দুটি সান্ত্রীও বোধ হয় আমাকে সেরূপ একজন কূট রাজনৈতিক ভেবেই পথ ছেড়ে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় দরজাও তেমনি গম্ভীরভাবে পার হয়ে চলে গেলাম। দ্বিতীয় দরজার সান্ত্রী হয়তো ভেবেছিল প্রথম দরজায় 'পাস' দিয়ে এসেছি। তারপর একটি উঠান। এখান থেকে দুদিকে দুটো পথ প্রধান মন্ত্রীর খাস দরজা অবধি চলে গিয়েছে। ডানদিকের পথ ধরে ডান-বাঁ না তাকিয়ে সেক্রেটারীর দরজায় উপস্থিত হলাম। পথে চলার সময় লক্ষ্য করলাম, দোতলার একটা ঘরের তিনদিকের এবং তেতলার সবদিকের দেওয়ালই কাঁচের। তারপর লক্ষ্য করলাম, তেতলার ঘরটাতেই অনেক লোক বসে আছেন, অনেকে দাঁড়িয়েও আছেন।

সেক্রেটারী বেশ ভাল ইংলিশ জানতেন। তাঁর সংগে ইংলিশেই কথা হ'ল। প্রধান মন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করতে এসেছি জানালে তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি নামগোত্রহীন একজন ভবঘুরে বলায় তাঁর মুখে অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠল। তবুও ভদ্রলোকটি লোক ভাল, একথা বলতে হবেই। তিনি আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে জেনে আসতে গেলেন, আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সময় হবে কি না। জানতাম, আমার মত অখ্যাত ব্যক্তিদের সংগে সাক্ষাৎ করার সময় কোন বড় লোকেরই হয় না। আমার মত লোক তাঁদের কাছে পৌঁছুলেই তাঁদের কাজের হিড়িক লেগে যায়। ভাবছিলাম আমার কাছে যে পরিচয়-পত্রখানা আছে তা সেক্রেটারীর হাতে দেওয়া যায় কি না, এমনি সময় সেক্রেটারী এসে জানালেন, "প্রধান মন্ত্রীর সময়ের বড়ই অভাব, তিনি দুঃখের সহিত জানাচ্ছেন তাঁর সংগে সাক্ষাৎ হবে না।" ভেবে দেখলাম অহমিকা বাজে কথা, কাজ করতে হবে। দেরী না করে, পকেট থেকে একখানা পরিচয়-পত্র বের করে সেক্রেটারীর হাতে দিলাম এবং বললাম, "এখন একবার আপনি ওপরে যান, এখন হয়তো আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে তাঁর সময় হতে পারে।"

সেক্রেটারী কাগজখানা খুলেই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বেল বাজালেন যেন ঘরে আগুন লেগেছে। তিনজন চাকর হাজির হ'ল। তাদের আমার খিদমত করার জন্য বলে দিয়ে তিনি উপরে চলে গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরে আমাকে হাত ধরে প্রধান মন্ত্রীর সকাশে নিয়ে গেলেন।

প্রধান মন্ত্রী বাদশাহী চালে সোফার উপর বসেছিলেন, ভাবছিলেন হয়তো আমিও সেই শ্রেণীরই পর্যটক অথবা দর্শনপ্রার্থী হব যারা এখনও কুর্ণিশ করে নিজেদের ধন্য মনে করে। আমি তাঁকে মাত্র ছোট্ট একটা নমস্কার করলাম।

যে পরিচয়-পত্র আশাতীত সুফল প্রসব করল, সেখানি মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট তাঁরই আত্মীয়ের দেওয়া ছিল। তিনি চীনের হার্‌বিন্ শহরে বাস করতেন। মন্ত্রী মহাশয় প্রথমত তাঁর আত্মীয়ের সংবাদাদি জেনে নিলেন। তাঁর সেই আত্মীয় জার্মানীতে ছিলেন এবং সেখানেই বিয়ে করে স্ত্রীকে সংগে নিয়ে সোভিয়েট রুশিয়ার ভেতর দিয়ে চীনে পৌঁছানোর পর হার্‌বিন্ শহরে স্থায়িভাবে বসবাস করতে থাকেন।

তারপর আমরা অনেকক্ষণ দেশ-বিদেশের নানা কথা আলোচনা করলাম। প্রধান মন্ত্রী আমাকে রাজ-অতিথিরূপেই গ্রহণ করলেন এবং কাবুল হতে হিরাত পর্যন্ত ভ্রমণের সকল রকম সুবিধা করে দিলেন। কাবুল হোটেলে থাকবার জন্য তিনি বলেছিলেন, কিন্তু তাতে রাজী হই নি। আসামাই মন্দিরেই থাকা ভাল হবে বললে তিনি তৎক্ষণাৎ বৈদেশিক আফিসে নির্দেশ দিলেন, আসামাই মন্দিরে থাকতে আমার যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার যেন বন্দোবস্ত করা হয়। আমিও সেদিনের মত নিশ্চিন্ত মনে আসামাই মন্দিরে ফিরে গেলাম।

পৃথিবীতে মানুষের প্রচারিত যত ধর্ম আছে, তার স্থায়িত্ব রাজশক্তির সাহায্যের ওপর নির্ভর করে। রাজাদেশ ধর্মের প্রচলিত বিধি-নিষেধকেও ডিংগিয়ে যায়। পাথরের দেবতা নির্জীব, রাজশক্তি সজীব; সেজন্য ধার্মিকগণ ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক রাজাদেশ মানতে বাধ্য হন। আসামাই মন্দির

হিন্দুর। আমি মন্দির হতে বহিষ্কৃত হতে চলেছিলাম, কিন্তু রাজানুগ্রহে সেই আসামাই মন্দিরে বিগ্রহের মতই অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাস করবার অধিকার পেলাম। পূজারী যখন দেখল, বৈদেশিক সচিবের আফিস হতে লোক এসে আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তত্বাবধান করছে, এবং জনরব রটেছে, হয়তো রাজা জাহির শা একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করবেন, তখন পুরোহিত ধরে নিল আমি একটা যে-সে লোক নই, নিশ্চয় উচ্চস্তরের লোক।

লোকে দেবতার পূজা করে না, পূজা করে দেবতারূপী ভয়কে। ভক্তি হ'ল ভয়ের একটা অংগ। ভক্তিভরে পাথরের দেবতার চরণসেবা করি কেন? অন্তিমে সুখশান্তি পাব বলেই। পেছনে রয়েছে নরকের সেই চিত্র, দেখিয়ে দেয় স্বর্গের সুখশান্তি। কল্পিত নরক যদি না সৃষ্টি করা হত, তবে কল্পনায় স্বর্গের সৃষ্টিও মানুষের দ্বারা হত না। হয়তো পূজারী ঠাকুরের কাছে মূর্তিমান নারকীয় জীব বলেই প্রতিপন্ন হয়েছিলাম, কিন্তু আমার সহায় ছিল রাজানুগ্রহ। সেজন্যই পূজারী আমার প্রতি মনে মনে ঘৃণার ভাব পোষণ করলেও বাইরে দেবতার মতই ভক্তি প্রদর্শন করতে বাধ্য হলেন।

প্রধান মন্ত্রী শুধু থাকবার ব্যবস্থা করলেন না, আর্থিক দুর্গতিরও অবসান ঘটালেন। এতে আমার লাভ হ'ল প্রচুর। এখানে পেট ভরাবার জন্য আসি নি, এসেছি কাবুল শহর দেখতে। কাবুলের কথা ভারতের লোক অতি অল্পই অবগত আছে। যতটুকু জানবার সুবিধা হয় ততটুকুই জেনে নিতে হবে।

পরদিন যখন বের হব, এমন সময় পূজারী বললেন, "আপনার একাকী পথে বের হওয়া উচিত হবে না, সংগে লোক থাকা সমীচীন। লোক সংগে থাকলে সর্বসাধারণ আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করবে।" পূজারীকে বললাম, "আমার লোকের দরকার নেই। ভাবলাম, আমার আবার ইজ্জত! আমার দেশ পরাধীন, আমরা দাসখত লিখে দিয়েছি। এরূপ পরাধীন জাতের লোকের

পক্ষে ইজ্জতের ভয় করা মূর্খতা ছাড়া আর কি হতে পারে? আর কোন কথা না বলে একাই বের হয়ে পড়লাম।

চলছিলাম বৃটিশ কন্‌সালের বাড়ির দিকে। বৃটিশ কন্‌সালের সংগে আমার একটু দরকার ছিল। পথ বরফে ঢাকা। সাদা বরফের ওপর সূর্যের কিরণ পড়ায় চোখ ঝলসে যাচ্ছিল। চোখে রংগিন চসমা থাকায় বিশেষ কষ্ট হচ্ছিল না, কিন্তু খালি চোখে এরূপ অবস্থায় বাইরে বেশিক্ষণ থাকলে অন্ধ হবার সম্ভাবনা থাকে। পাঠানরা অনেকেই সেজন্য পাগড়ির পিছনের ঝুলানো কাপড়টা দিয়ে চোখ ঢেকে পথ চলে।

বিদেশে যাবার পর বৃটিশ কন্‌সালের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আমার মোটেই ইচ্ছা হত না, কারণ প্রায় স্থলেই দেখা-সাক্ষাৎ করতে গিয়ে অপমানিত হতে হয়েছে। কিন্তু সোফিয়া, তেহরান, কোবি, সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো এই কটি স্থানের বৃটিশ কন্‌সালগণ আমার সংগে আপন লোকের মতই ব্যবহার করেছিলেন। কেন যে তাঁরা আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছিলেন তার কারণ আমার অজানা নয়। কারণ হ'ল তাঁরা অন্তরে ক্যামিউনিস্ট মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ছিলেন। দুনিয়ায় যারা ক্যামিউনিস্ট মনোভাব পোষণ করে তাদের কারো দ্বারা আমি অপমানিত হই নি, নিগৃহীত জাতের লোক বলে তাদের কাছ থেকে বরং সহানুভূতিই পেয়েছি। চীনা বল, জাপানী বল, জার্মানী বল আর আমেরিকানই বল, যদি সে ন্যাশনেলিস্ট হয় তবে সে ভারতবাসীকে ভালবাসতে পারে না। সে মৌখিক ভালবাসা দেখাবে নিজের মতলব হাসিল করবার জন্য। সময় এবং সুযোগ পেলেই সর্বনাশ করবার চেষ্টা করবে। এটা ধ্রুব সত্য।

চীন, জাপান এবং অন্যান্য পূর্বদেশ ভ্রমণ করে দেশে ফেরবার পর বুঝতে পেরেছিলাম, লোকে জানে শুধু সাদা চামড়ার পূজা করতে। আমারই সামনে দু'হাত খুলে এদেশের ধনীরা দান করছে শুধু সাদা চামড়াওয়ালা পর্যটকদের।

কিন্তু আমি যখনই আমার দেশবাসীর কাছে উপস্থিত হয়েছি তখনই তারা চেষ্টা করেছে আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাপ করতে, অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করবার চেষ্টাও যে কেউ কেউ করেনি তা নয়। কিন্তু আমি উপলব্ধি করেছিলাম, আমার দেশের ছাত্র-সমাজ দরিদ্র অথচ তাদেরই কাছে হাত পাততে হত। তারা যা দিত তাতে আমার পেট ভরত না, কিন্তু আধপেটা খেয়েও আত্মতৃপ্তি লাভ করতাম। ছাত্র-সমাজের প্রতি আমার অন্তরের শুভকামনা স্বতঃই উৎসারিত হয়ে উঠত। চীনের ছাত্রছাত্রীরা আজ চীনকে বাঁচিয়ে রেখেছে সে দৃশ্য আমি দেখেছি। তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু ব্যক্তিগত উন্নতিসাধন নয়। দেশের স্বাধীনতা, দেশের সর্বাংগীন কল্যাণসাধনের আদর্শই তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে।

ক্রমাগত বিফল মনোরথ হয়ে দিল্লীতে পৌছে ভেবেছিলাম আফগানিস্থানে গিয়ে হয়তো সাহায্য পাব না। আফগান জাত হয়তো পর্যটক কাকে বলে তাও জানে না। কিন্তু তা বলে আমার পর্যটন বন্ধ করি নি। এগিয়ে চলছিলাম।

কর্মত্যাগের পর আমার যা জমানো অর্থ ছিল, তা সবই ভারতীয় বেকারদের সাহায্যার্থে দিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভুলক্রমে একটি বেঙ্কে টাকা দান করতে ভুলে গিয়েছিলাম। সিংগাপুরে ফিরে আসবার পর বেঙ্ক-মেনেজার সংবাদপত্রে সিংগাপুরে ফিরে এসেছি সংবাদ পেয়ে আমাকে ডেকে পাঠান এবং আমার হিসাবে একুশ পাউণ্ড জমা আছে জানিয়ে দেন। এবার কিন্তু জমানো টাকা দান করতে ইচ্ছা হ'ল না; কারণ কেনেডা সরকার আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্য-প্রীতি বলে কিছু নেই। কাজেই টাকা অপরিহার্য। সেই কথাটা 'প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি' নামক বইএ বলা হয়েছে। বেঙ্ক-মেনেজারকে জানিয়েছিলাম, গচ্ছিত টাকা যেন কাবুলের বৃটিশ কন্‌সালের কাছে পাঠিয়ে দেন। কাবুলের বৃটিশ কন্‌সালকেও ঐ সংগেই লিখেছিলাম, তিনি যেন দয়া করে আমার টাকাগুলি কাবুলে না পৌছা পর্যন্ত তাঁর কাছে জমা রাখেন। সেই টাকার সংবাদ নেবার জন্যই কন্‌সাল আফিসে চলছিলাম।

পর্যটক হয়ে নিজের দেশের গভর্নমেণ্টের কন্‌সাল্‌ অফিসে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। সাধারণ লোক ভাবে, লোকটা হয়তো পর্যটক নয়, একটা গুপ্তচর। যারা প্রকৃতই গোয়েন্দা তারা কন্‌সাল্‌ আফিসের সংগে সম্বন্ধ রাখে, কিন্তু বাইরে ভান করে তাদের সংগে কন্‌সালের কোন সম্পর্ক নেই। যে সরকারের পাসপোর্ট নিয়ে পথে বের হয়েছি সেই সরকারের বিরুদ্ধে যদি কিছু বলি, তাহ'লে অনেক সময় স্থানীয় লোক আমাকে গুপ্তচর বলেই মনে করবে। এসব কথা ভাল করেই জানতাম, কিন্তু নিজে খাঁটি থাকলে ভয়ের অথবা নতি-স্বীকারের কোন কারণ থাকে না।

কন্‌সাল অফিসে পৌছতে পাঁচটি চায়ের দোকানে চা খেয়ে শরীর গরম করতে হয়েছিল। কন্‌সালের বাড়ির কাছে একটা ফাঁকা মাঠ। সেটা পেরিয়ে কন্‌সালের দরজার সামনে এসেই দেখতে পেলাম তু'জন পাঞ্জাবী মুসলমান রৌদ্রে বসে আছে। এই ধরণে বসে থাকা রাজভক্ত প্রজার দ্বারাই সম্ভব। প্রচণ্ড শীতে আমার শরীরের রক্ত জমে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি করে দরজায় আঘাত করলাম। দরজা খোলামাত্রই সোজা কন্‌সালের ঘরে তাঁকে নমস্কার করলাম এবং কাছের প্রজ্জলিত আগুনটার কাছে হাত তুটা বেড়িয়ে দিলাম। ভাবছিলাম ইনি কন্‌সাল হ'লে কি হবে, মানুষ তো, আমিও মানুষ। কিন্তু শীঘ্রই বুঝলাম তাঁর চক্ষে আমি মানুষ নই, এমন কি কুকুর-বিড়ালও নই, গরু-গাধাও নই, আমি একটি বনমানুষ,—যাকে হত্যা করলে ফাঁসিতে চড়তে হয় না, গুকিয়ে মারলে কেউ কিছু বলবার অধিকার রাখে না, গুলি করে মারলে চার পয়সা দামী বুলেটের জন্যই লোকে আপশোষ করে। কন্‌সাল্‌ মহাশয় আমাকে বললেন, "আপনার টাকা এসেছিল, ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং এই প্রজ্জলিত আগুনটি তাঁরই ব্যবহারের জন্য, গুড বাই, অর্থাৎ চলে যাও।" কি আর বলব। স্বাধীন দেশের মানুষতো নই, সেজন্য অবনতমস্তকে যখন কন্‌সালের ঘর হতে বের হয়ে আসছিলাম, তখন কয়েকজন পাঞ্জাবী মুসলমান, যারা কন্‌সালের

বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল, তারা জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে, তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? নির্বাক হয়ে পথ চলছিলাম, ফেরবার পথে কোথাও চা খেলাম না। প্রচণ্ড শীতের অনুভূতি পর্যন্ত হচ্ছিল না। একদম শীতগ্রীষ্ম-বোধহীন হয়ে শহরের দিকে, মাথা নত করে পলাতক পশুর মত, কোথাও আশ্রয় পাবার জন্য এগিয়ে চলছিলাম। কাকে কি বলব? দেশ নাই, জাত নাই, আমার মাঝে মনুষ্যত্ব নাই—এই ঘৃণিত জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে কি লাভ? সকাতরে পথকে বলছিলাম, "আমাকে আশ্রয় দাও, তোমার বুকের ওপর সবাই হাঁটে তাই আমিও হাঁটছি। তোমার মাঝেই আমার লয় হোক, তুমি জাতবিচার কর না, বাদামী এবং সাদাতে তুমি পার্থক্য দেখাও না। স্বাধীনে পরাধীনে তোমার কাছে কোনও তারতম্য নাই, তুমি সকলের জন্য উন্মুক্ত। তোমার বুকের ওপর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী মদগর্বে যেমন হাঁটছে, দরিদ্র পরাধীন জাতের লোকও তেমনি পদক্ষেপ করছে। তুমি পুঁজিবাদীরও নও, শাসক-জাতেরও নও। তুমি দাম্ভিক ভাড়াটে গুণ্ডারও নও, দীন মজুরেরও নও। তুমি সকলের। তুমি আমার একমাত্র ভরসা। তুমি ভরসা পরাধীনের, তুমি ভরসা নামগোত্র-হীনের, তুমি আমার চরম আশ্রয়। তোমার ওপর দিয়ে চলতে চলতেই যেন আমার পরাধীন জীবনের শেষ হয়।"

এই ধরণের চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে শহরে এলাম এবং একটি বড় চায়ের দোকানে চা খেতে বসলাম। অনেকেই আমার মুখাকৃতি দেখে দুঃখিত হ'ল এবং কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করল আমার শরীর ভাল আছে কি না? সকলকেই এক কথায় জবাব দিলাম শরীর ভাল নাই। সেই সংগে মনে হয়েছিল আমানউল্লার কথা যিনি বুদ্ধি খাটিয়ে বৃটিশকে হটিয়ে দিয়ে নিজের দেশ স্বাধীন করেছিলেন।

রাজার রাজ্য কি করে চলে প্রজা সে সংবাদ রাখত না। কয়েক বছর আগেও বাংলা দেশের বৃটিশ রাজ্য কি করে চলত, তার সংবাদ বাংগালী সর্বসাধারণ ক'জন রাখত? জমিদার, তালুকদার, মিরাশদার, খুদে জোতদার—

এবং জোতদারের পর হ'ল চাষার স্থান। চাষা জানে শুধু জোতদারকেই। বাংলা দেশের শিক্ষা এবং গণজাগরণের সংগে আফগানিস্থানের গণজাগরণের তুলনা হতে পারে না। গণজাগরণের হিসাবে বাংলা দেশ আফগানিস্থানের বহু উচ্চ স্থান দখল করে ছিল। আফগানিস্থান স্বাধীন আর ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন। বাংলা দেশ ভারতবর্ষের একটা অংশমাত্র। বাংগালী শিক্ষিত হয়েও বাংলা দেশের সংবাদ রাখে না। কিন্তু শিক্ষার হিসাবে কাবুলীরা আমাদের অনেক পেছনে থাকা সত্ত্বেও এদের বৈশিষ্ট্য থাকায়, ভারতীয় কৃষকের মত পাঠান কৃষক জোতদারের হাতে কাবু হয়ে পড়ে নি। পাঠান বোঝে খাজনা দিতেই হবে; অতএব ন্যায্য খাজনা তুমি রাজা স্বয়ং এসে নাও কিংবা একটা বাঁদরের গলায় থলি বেঁধেই পাঠিয়ে দাও, খাজনা পেয়ে যাবে। কিন্তু পাঠান চাষা অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয় দেয় না। নায়েববাবু, পেয়াদাবাবু, কেরানিবাবু, পুলিশবাবু—এসবের ধার ধারে না, অন্যায় করেছ কি মরেছ—অটোমেটিক মেশিনগান চালিয়ে প্রতিকার করবে ঐ দরিদ্র চাষা। সে জীবনের ভয় করে না। আর্ম এক্ট কাকে বলে তা সে জানে না। আর্ম এক্ট আফগানিস্থানে চলে না। যেখানে আর্ম এক্ট নেই, সেখানে আর্ম-এর অপব্যবহারও হয় না।

যেখানে লোকের চলতি পথে স্বাধীনতা আছে, সেখানে লোকে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র—এসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। পাঠানরা স্বাধীন, তাদের মাথা ঘামাতে হয় না, দুরানী বংশ রাজা হ'ল, কি খিলজাই বংশের লোক রাজা হ'ল। তারা কখনও ভাবে না সরকারী চাকুরি কে পেল আর কে না পেল। তাদের আত্মরক্ষা করার জন্য তলোয়ার, বন্দুক, পিস্তল, অটোমেটিক মেশিনগান রয়েছে, সেজন্যই সে কাউকে ভয় করে না। নিজের পরিবার, গ্রাম, এমন কি ছোট ছোট সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী পর্যন্ত নিজেরাই নিজেদের দেখাশুনা করে থাকে। রাজার পেয়াদা অথবা চাকর গ্রামের মালিকের কাছে হাজির হয়ে রাজকীয় আদেশ জানিয়ে আসে। গ্রামের মালিক সবাইকে ডেকে

রাজার আদেশ শুনিয়ে দেয়। সর্বসাধারণ যদি সে আদেশ ভাল বোঝে তবে মেনে নেয়, নতুবা অগ্রাহ্য করে। রাজার আদেশ সকল সময় চলে না, গ্রামের লোক স্ত্রীপুত্রপরিবার সমেত কবরস্থ হতে রাজী, তবুও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়। সেজন্যই আফগান জাত নানাদিকে বাংগালীর পেছনে থেকেও বাংগালীর চেয়ে একদিকে উন্নত-জীবন কাটাচ্ছে। এখানে কথা ওঠে, যদি কোন গ্রামে পাঁচঘর হিন্দু, দশঘর শিয়া এবং পঁচিশ ঘর স্থন্নি থাকে, তবে দুটি সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর লোক সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা শুনবে কেন? এখানে একটা মজার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। আফগানিস্থানের শাসন-নীতি ভেদনীতির পক্ষপাতী নয়। আফগান জাতও ভেদনীতির সমর্থক নয়। আমার জমি আমি চাষ করছি। আমার বাড়িতে আমি বাস করছি। ঋণের দায়ে আমার কিছুই যাচ্ছে না, আমি ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে কার সংগে বিবাদে প্রবৃত্ত হব? জমির জন্য আমাদের ঝগড়া হয় তার একমাত্র কারণ হ'ল, বুদ্ধিজীবীরা নানারূপ বদমতলব কার্যে পরিণত করার জন্য আইনের আশ্রয় নেবার পথ বাতলে দেয়। যারা আইনের আশ্রয় নেয় তারা দরিদ্র এবং কাপুরুষ। আফগানরা কলহ ইত্যাদির মীমাংসা আইনজীবীর হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজেদের হাতেই রেখেছে। দুরভিসন্ধি যেখানে নেই সেখানে মেজরিটি মাইনরিটির কথা মোটেই ওঠে না। বন্দুক কামান, ছোরা তলোয়ার এ সবই হ'ল তাদের আত্মসম্মান বজায় রাখার পয়লা নম্বরের অস্ত্র। সেজন্য আফগানরা মানুষের অধিকার নিয়েই সসম্মানে সুখে আছে। শাসকদেরও ভেদনীতির আশ্রয় নেবার প্রয়োজন হয় না।

রাষ্ট্র স্ত্রী-জাতির কোন স্বাধীন সত্তা স্বীকার না করলেও আফগানরা মায়ের জাতের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণে কখনই শৈথিল্য দেখায় না। স্ত্রীলোকের অসম্মানকারীর প্রতি কড়া শাসনের ব্যবস্থা নিজেদের হাতেই রেখেছে, রাজকর্মচারীর ওপর ছেড়ে দেয় নি। ঘরে সাপ ঢুকলে যেমন গ্রামের লোক পরস্পরের

শত্রুতা ভুলে গিয়ে সাপকে হত্যা করে, তেমনি পাঠানরা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারীকে হত্যা করতে পর্যন্ত দ্বিধা করে না। হত্যা তিন রকমের হয়ে থাকে। গুলি করে মারা, পাহাড়ের ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া, এবং শরীরটার নীচের ভাগ মাটিতে পুঁতে ফেলে বাকি অর্ধেকটাতে ক্রমাগত ঢিল ছোঁড়া।

পাঠানরা শুধু যে স্বদেশের স্ত্রীলোকেরই মান-ইজ্জত রক্ষায় সজাগ তা নয়, কোনও বিদেশী স্ত্রীলোকেরও আফগানিস্থানে অত্যাচারিত হবার আশংকা নেই। নারীর সম্মান রক্ষা সম্বন্ধে হিন্দুপ্রতিনিধি একটা ঘটনা বলেছিলেন।

আমেদাবাদ শহরের কোনও এক হিন্দু রমণী স্বেচ্ছায় একটি পাঠানকে বিয়ে করে কাবুলে আসে। কাবুলের আবহাওয়া তার মোটেই পছন্দ হয় নি। বোরখা পরতেও তার ভাল লাগে নি। সেজন্যই বোধ হয় স্ত্রীলোকটি পাঠানকে বার বার আমেদাবাদে ফিরে যেতে অনুরোধ করে। পাঠান কিন্তু আমেদাবাদে ফিরে যেতে সম্মত হ'ল না। স্ত্রীলোকটি দেশে ফিরে আসার জন্য নানারূপ চেষ্টা করেও যখন কৃতকার্য হ'ল না, তখন একদিন পথে এসে চীৎকার করে জনসাধারণের কাছে তার দুঃখের কথা বলে। পথের লোক তৎক্ষণাৎ প্রতিকার করতে গিয়ে দেখে পাঠান গৃহ ছেড়ে পালিয়েছে। জনতার তখন কিছুই করার ছিল না। তারা তখন স্ত্রীলোকটিকে পুলিশের হাতে অর্পণ করে। পুলিশ রমণীটিকে হিন্দুপ্রতিনিধির বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। তিন মাস পরে বৃটিশ সরকার হিন্দুরমণীটির দেশে ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করেন।

অন্তত মনের দুটি অবস্থায় আমোদ-প্রমোদ বিশেষ দরকার হয়ে পড়ে। প্রথমত, শরীর যখন সুস্থ থাকে, মনে যখন কোনরূপ উদ্বেগ থাকে না, তখন নিরুদ্বেগ প্রফুল্লতাকে আমোদ-আহ্লাদের ভেতর দিয়ে ব্যক্ত করতে মন স্বতঃই উৎসুক হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, মন যখন অপমানে এবং ক্ষোভে একদম মুষড়ে পড়ে, তখন ভগ্নহৃদয়কে আমোদ-আহ্লাদের একটা সাময়িক উত্তেজনার

মধ্যে আচ্ছন্ন করে রাখলে মনে বেশ শান্তি আসে। নানা কারণে আমার মন দমে গিয়েছিল। অপমানের বোঝা আর সইতে পারছিলাম না। সে জন্যই আমোদ-প্রমোদের সন্ধানে বের হয়েছিলাম। আফগানিস্থানে সিনেমা নেই যা দেখে মনে একটু শান্তি আনতে পারা যায়, অপেরা নেই যেখানে গিয়ে মনের বিষাদ লাঘব করতে পারা যায়। শীতের সময় নৃত্য অথবা হৈহল্লাও নেই যে তা দেখে সময় কাটানো যায়, অথচ আমার কাবুল শহরে আর থাকতে মোটেই ভাল লাগছিল না। মোটরে করে গজনি হয়ে কান্দাহার যাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল, কিন্তু পথে প্রচুর বরফ জমে থাকায় গাড়ি চালানো মোটেই সম্ভব ছিল না। তখন বাধ্য হয়েই পুরা একটা মাস আমাকে কাবুল শহরে থাকতে হ'ল।

কাবুলে পুরা এক মাস থাকতে বাধ্য হ'লেও অলসভাবে দিনগুলি কাটিয়ে যাই নি।

কাবুলে একজন পার্শি ব্যবসায়ীর সংগে পরিচয় হয়। তিনি পর্যটকদের বড়ই ভালবাসেন। আমাকে একাকী সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বহির্গত হতে দেখে তিনি খুব বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করেন। তাঁর প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে সক্ষম হওয়ায় তিনি খুশি হলেন বটে, কিন্তু আমি যে মতবাদ পোষণ করি তাতে তিনি দুঃখিত হন। এত সাধের স্বর্গরাজ্য কাবুল—যেখানে যাবার পর যা চাওয়া যায় সবই পাওয়া যায়—সেখানে আমি থাকতে চাই না, এমন কি সুখ বলে এখানে কিছু আছে তার অস্তিত্বও বিশ্বাস করি না, এতে দুঃখ হবার কথাই। কথায় কথায় তিনি প্রশ্ন করলেন, এ শহরে নানারূপ দ্রষ্টব্য জিনিস আছে, তা আমি দেখেছি কি না? জিজ্ঞাসা করে জানলাম এখানে অনেক পুরাতন বই আছে। হালে বোখারা হতে যারা এসেছে তারা সে সকল বই সংগে করে এনেছে।

সেই বইগুলির অনুসন্ধানে বের হলাম। কোথায় এবং কার কাছে বইগুলি আছে তা জানা ছিল না। পার্শি ব্যবসায়ীও তা বলে দেন নি। ফিরে এলাম সেই চায়ের দোকানে যেখান হতে আমি বার বার আঁধারের মাঝেও আলোর সন্ধান পেয়েছিলাম। চায়ের দোকানে ক্রমেই পুরাতন বয়ের দেখা পাওয়া গেল। এবার সেই বয় আমার সংগে কথা বলল। এই যুবকের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয় পেশোয়ারে একটি বই-এর দোকানে। তখন তার পরনে ছিল পাজামা এবং পাঠানের পাগড়ী। এবার সে নূতন পোশাক পরেছে। দেখতে বেশ সুন্দর দেখায়। বইএর সন্ধান তারই কাছে জিজ্ঞাসা করলাম। বইএর সন্ধান কার কাছে গেলে পাব সে বলে দিল। সে সত্বরই রুশ দেশে যাবে তাও জানালে। রুশ দেশে যাবে সে একা নয়, আরও অনেকে। দুঃখের সহিত বললে তার দু'জন সংগীকে আফগান রাজ্যের মধ্যেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। বাংগালী বাবু বয় সেজে রয়েছিলেন এতে আমার রাগ হয়েছিল, কিন্তু যখন শুনলাম তারই সাথী দু'জনকে হত্যা করা হয়েছিল তখন বড়ই দুঃখিত হয়েছিলাম এবং বয়কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম, "মাতৃভূমিকে যদি মুক্ত করতে হয় তবে মরণকে বরণ করে নিতে হবেই।"

চায়ের দোকান হতে বের হয়ে বয়-কথিত মিঃ আবদুল্লার আফিসের দিকে রওনা হলাম। আবদুল্লার সংগে পূর্বেই পরিচয় হয়েছিল। তিনি একজন পাঞ্জাবী মুসলমান। তাঁর অনেক বদনাম রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের কাছ থেকে শুনেছিলাম, এমনকি তিনি তাঁর ওয়ার্লড ফেডারেশন নামক মাসিক পত্রে আবদুল্লাকে লক্ষ্য করে অনেক কথাই লিখেছিলেন। আমি সেই আবদুল্লার বাড়িতে গিয়েই বইএর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করলাম। আবদুল্লা শিল্প-বিভাগে মন্ত্রিত্ব করেন। তাঁর অধীনে অনেক মজুর অনেকগুলি কম্বল এবং দেশলাইএর কারখানাতে কাজ করছিল। তাঁর কারখানা এবং মজুরদের কাজ দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলাম, কিন্তু বইএর কোন সন্ধান না পেয়ে

দুঃখ হয়েছিল। অবশেষে তাঁরই কারখানার একটি হিন্দু মজুর বইএর সন্ধান দেয়।

বই—যা দেখতে আমার খুব আগ্রহ ছিল না, তাই শেষটায় আমার মনকে গভীরভাবে টানছিল। প্রশ্ন হ'ল বইগুলো দেখে আমার কি লাভ হবে? কোনও ধর্মগ্রন্থ আমার মনে দাগ কাটতে পারবে না তা যে ধর্মেরই হোক না কেন? এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই একজন বৃদ্ধ পুস্তক-ব্যবসায়ীর দোকানে প্রবেশ করলাম। দোকানী বেশ ভদ্র। দোকানে প্রবেশ করা মাত্রই লোকটি আমার সংগে কথা বললেন। দোকানীর কথা বলার ধরনটি বেশ ছিল।

—আপনি ধর্মগ্রন্থ দেখতে চান না, তবে কি রকমের বই দেখাব বলুন? আচ্ছা, একটা বড় বই আছে যাতে ভাষা সম্বন্ধে নানা তথ্য লেখা রয়েছে। আপনি গুণী লোক, সে বইটাই দেখুন।

আমি তাতে রাজী হলাম এবং পুস্তক প্রদর্শনের রুমে বসলাম। ঘরটি ছোট। দুটিমাত্র খিড়কি দরজা। খিড়কি দরজা দিয়ে যে আলো আসে তা প্রচুর ছিল না। পুস্তক-বিক্রেতা বইখানা আমার সামনে রেখে দিয়ে বললেন, "বইখানা গ্রীক ভাষায় লিখিত বলেই মনে হয় কিন্তু অনেক গ্রীক বলেছেন বইখানা গ্রীক ভাষাতে লিখিত নয়।"

বইখানা হাতে নিয়ে তার কাগজ পরীক্ষা করছিলাম দেখে দোকানী হেসে বললেন, "এতে কোন লাভ হবে না—আপনি অক্ষর দেখুন তাতে লাভ হবে।"

পৃথিবীতে নানারকমের অক্ষর আছে। অক্ষর শব্দ লেখবার সাংকেতিক চিহ্ন মাত্র। এই সাংকেতিক চিহ্নের মধ্যে কোন্ দেশীয় সাংকেতিক চিহ্ন সবচেয়ে পুরাতন বের করা কঠিন কাজ। বইখানার অক্ষরগুলি পরীক্ষা করে দেখলাম, অক্ষরগুলির কোনরূপ সংস্কৃতি নাই। যাকে সংস্কার করে নেওয়া হয়েছিল তাকে বলা হয় সংস্কৃত। তবে কি এরূপ অক্ষরকেই সংস্কার করে নেওয়া

হয়েছিল? অক্ষরগুলির সংগে পুরাতন পাঞ্জাবী অক্ষরের বেশ সাদৃশ্য ছিল যাকে বর্তমানে বলা হয় "গুরুমুখী" অক্ষর।

ইচ্ছা হ'ল বইখানা কিনে ফেলি। কিন্তু বইখানার দাম শুনে মনে হ'ল, আমি কেন, অনেক ধনীও বইএর দাম শুনে ঘাবড়ে যাবেন। বইখানা দেখাই হ'ল, কিন্তু দুঃখের বিষয় তার কিছুই বোধগম্য হ'ল না। অনেকক্ষণ বইখানা দেখে শেষটায় ফিরে এলাম।

পুরাতন বই ছিল, পুরাতন ভাষা ছিল। কিন্তু নতুন এসে এক এক ধাক্কা মেরেছে আর পুরাতনকে ভেংগে ফেলে দিয়ে নিজের স্থান করে নিয়েছে। আফগানিস্থান যদিও পুরাতন এবং নতুনের দ্বন্দ্বক্ষেত্র, তবুও এই দেশ আজও পুরাতনকেই আঁকড়ে ধরে আছে।

স্থানীয় আর্যসমাজীরা নতুন নিয়মে আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য চেষ্টা করছিল। সনাতনীরা বাধা দিতে গিয়ে বলছিল, তা কি হতে পারে? এতে হয়তো 'পক্ষপাতপূর্ণ' রাজনীতি এসে যেতে পারে। এখানে পক্ষপাত শব্দটির ব্যবহার দেখে আমায় মনে হ'ল, সনাতনীরা শব্দের ব্যবহার করতে জানে, কিন্তু পক্ষপাত কাকে বলে তাও হয়তো ভাল করে জানে না। আর্যসমাজী এবং শিখরা সনাতনীদের কথায় কান না দিয়ে সভার বন্দোবস্ত করল।

মহাভারত-রচয়িতা ব্যাসদেব দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করার পর যখন কোন রাজবাড়িতে যেতেন, তখন তাঁকে যেভাবে অভ্যর্থনা করা হত, আমাকেও ঠিক সেরূপভাবেই অভ্যর্থনা করার বন্দোবস্ত হ'ল। যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হয়ে সমবেত জনমণ্ডলী কর্তৃক সংবর্ধিত হলাম। আমাকে একখানা বেদীতে বসতে হ'ল। তাতে বসে ঠিক পূর্বকালের কথকদের প্রথামত আমার ভ্রমণ-কথা বলতে আরম্ভ করলাম। সভায় সভাপতি কেউ ছিলেন না। শুধু একজন লোক আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েই ভিড়ের মধ্যে বসে পড়লেন।

যারা গঙ্গার ধারে বসে কথকতা শুনেছেন, তাঁরা দেখে থাকবেন কথকেরা কেমন করে শ্রোতার মন আকর্ষণ করে থাকে। আমি ইচ্ছা করেই সে ভাবেই কথকতা শুরু করেছিলাম। আমার ভ্রমণকাহিনী একদিনে সমাপ্ত হয় নি। আমার ভ্রমণকাহিনী অনেকের ভাল লেগেছিল বলেই বোধ হয় প্রথমদিন কথকতা করে তিনশত কাবুলি মুদ্রা দক্ষিণা পেয়েছিলাম। পরদিনও আবার সভার আয়োজন হয়। দ্বিতীয় দিনও অনেক লোক হয়েছিল। প্রথম দিন যারা কথকতা শুনেছিলেন পরের দিনও তাঁরা সদলবলে উপস্থিত হন এবং দ্বিগুণ দক্ষিণা দিয়ে পুণ্য অর্জন করেন। আমি লক্ষ্য করছিলাম, দক্ষিণা দেবার সময় দাতা তাঁর নিজের সমস্ত শরীরটায় টাকার তোড়াটি বুলিয়ে তোড়া থালাতে ঢেলে দিচ্ছেন। একটি যুবককে এরূপ করে টাকা দেবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললে, "এদের বিশ্বাস নিজের শরীর বুলিয়ে দেশভ্রমণকারীকে টাকা দিলে দাতার শরীরে কোন রোগ থাকে না এবং দেশভ্রমণকারী এই টাকার সাহায্যে যত দূরে যাবে দাতার বিপদ-আপদও ততদূরে চলে যাবে।" এদের ধারনা বিপদ-আপদও একধরণের শরীরধারী জীব। এদের কুসংস্কার ও অপরিণত বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমার খুব আমোদ হয়েছিল।

এরা তাদের এই সংস্কারকে দৃঢ়ীভূত করার মত একটি হেতুও পেয়ে গেল। আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলার দ্বিতীয় দিনের আসর ভাংগার পর আসামাই মন্দিরের পূজারীর দ্বিতীয় পুত্র তার দোকান হতে সেদিনের বিক্রয়লব্ধ টাকা নিয়ে আসার সময় পথে দেখতে পায় একটি পাঠান বরফে জমে গেছে। লোকটি জ্বালানী কাঠ বিক্রি করতে এসেছিল। পরদিন সেই ঘটনাকে উপলক্ষ করে পূজারী রটিয়ে দিল, ভাগ্যে তার ছেলে দেশভ্রমণকারীকে শরীর বুলিয়ে দশ কাবুলি দিয়েছিল নতুবা পাঠানের ওপর যে ভূত চেপেছিল সেই ভূত তার ছেলের ওপরও চড়াও হয়ে নিশ্চয়ই তাকেও শীতে জমিয়ে মেরে ফেলত। এতে আমার বেশ লাভই হল। যারা আমাকে ইতিপূর্বে

দান করে বিপদ্ মুক্ত হবার সুযোগ পায় নি তারা আমার আবাসস্থানে এসে দান করে যাচ্ছিল। প্রাপ্তির অংকটা বেশ মোটা রকমেই হয়েছিল। সনাতনীরা আমার পা ছুঁয়ে দান করতে আরম্ভ করল যাতে তাদের কোন লোক শীতে জমে না মরে।

শীতে জমে লোক মরে সে কথা সবাই জানে। আমাকে দশ টাকা দান করার দরুণ পূজারীর ছেলে মরে নি, তার বদলে মরেছে একটি পাঠান যে দান করেনি। এর মানে হল পর্যটককে দান করার দরুণই শীতরূপী ভূত তার ঘাড়ে না চেপে হতভাগ্য পথচারী পাঠানের ঘাড় মটকিয়েছে। অথচ কতদিন পূর্বে শীতে আমার নিজেরই কিরূপ বিপদ হয়েছিল সে কথা অনেকেই আমার মুখে শুনেছিল।

এরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু-সমাজ সম্বন্ধে কিছুই বলব না। তবে চিন্তা করছিলাম কাবুলের হিন্দুরা সত্যিকারের পাঠান কি পাঞ্জাব থেকে নূতন করে এসেছে। সেজন্য হিন্দুদের কাছে নানারূপ প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু তার কোনরূপ সদুত্তর পাওয়া অন্তত এদের কাছ থেকে সম্ভব ছিল না। আফগান-সরকার কোনও আদেশ দেবার সময় গোষ্টির প্রধানের নামেই আদেশ জারি করেন, সর্বসাধারণের নামে কোনও আদেশ দেওয়া হয় না। এতে দেখা যায় হিন্দুপরিবারগুলিও সমাজপতিদের আওতার মাঝেই এসে পড়ে। এখানে ধর্মের কোন কথাই ওঠে না। তুমি যে গোষ্টির লোক সেই গোষ্টির সংগে তোমাকে কাজ করতে হবে। পাঞ্জাব থেকে নবাগত হিন্দুদের কথা অবশ্য পৃথক।

বর্তমানে নবাগত ভারতবাসী আর আফগানিস্থানের নাগরিক হতে পারে না। তাদের প্রত্যেককে কুড়িদিন অন্তর পুলিশ স্টেশনে কাজকর্মের হিসাব দিয়ে আসতে হয়। আফগানিস্থানে নবাগত ভারতবাসী আর নাগরিক অধিকার না পেলেও পাঠানরা কিন্তু ভারতবর্ষে সে অধিকার হতে বঞ্চিত হয় নি। এটা মোটেই দুঃখের বিষয় নয়। একসময় আফগানিস্থান ভারতেরই অংশ ছিল।

স্বাধীন আফগানদের বৃটিশ সরকার তাদের পূর্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নি। আইন-কানুনের মানে কি? স্বাধীন মানুষ ইসারাতেই সব বুঝতে সক্ষম হয়।

নানারূপ সংবাদ জানবার চেষ্টায় যখন আমি ব্যস্ত ছিলাম তখন একদিন হিন্দু-প্রতিনিধি আমাকে তাঁর বাড়ীতে চা পানের নিমন্ত্রণ করেন। তাঁর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান না করে, বরং সাদরেই গ্রহণ করেছিলাম। জানতাম হিন্দু-প্রতিনিধি নিশ্চয়ই আমার কোন সাহায্য চাইবেন, অনিষ্ট করবার ক্ষমতা আর তাঁর নাই। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম স্থানীয় চিফ জাষ্টিস্‌ও তথায় নিমন্ত্রিত। আইনের সর্বময় কর্তাটি ধর্মে হিন্দু কিন্তু জাতিতে পাঠান। তাঁকে সনাতনী বলেই মনে হয়েছিল কারণ তিনিও বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন না।

কাবুল শহরে থাকার সময় ধর্ম সম্পর্কে কয়েক দিন আলোচনা করেই বুঝেছিলাম এটাও দ্বিতীয় নেপাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মের সপক্ষে কথা বলতে পার যত ইচ্ছা, কিন্তু ধর্মের বিপক্ষে বলবার, এমন কি ধর্মে যদি কোন গলদ থাকে তবে তাও নির্দেশ করবার অধিকার নাই। সরকারী আইন ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনতে রাজি নয়। সেজন্য আমাকে শুধু শুনে যেতেই হ'ত। যখনই কিছু নিয়ে প্রতিবাদ করতে হ'ত তখনই বক্তব্য বিষয়ের সমর্থনের জন্য শাস্ত্র হতে শ্লোক উদ্ধৃত না করলে চলত না। শাস্ত্রে আমার পাণ্ডিত্য ছিল না, কাজেই আমার চুপ করে থাকা ছাড়া উপায়ও ছিল না।

আইনের মালিক চিফ জাস্টিস্ এবং হিন্দুপ্রতিনিধি উভয়েই বৃদ্ধ এবং উভয়েই যুবতীভার্যার পাণিগ্রহণ করেছেন। চিফ জাস্টিস্ মহাশয় বাচ্চা-ই-সাক্কোর রাজত্বকালে দেশ হতে পালিয়ে যান এবং ইরান দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইরানীরা তাঁর প্রতি সদয় ব্যবহার করত যদি তিনি প্রথমেই হিন্দু বলে পরিচয় দিতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। পরিচয় দান-প্রসংগে নিজের গোষ্টির কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তাঁর গোষ্টির লোক এককালে ইরানীদের শাসক ছিল। তারপর যখন দেখলেন ইরানীরা তাঁর প্রতি ভাল ব্যবহার করছে না, তখন

তিনি নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। ইরান সরকার তাঁকে যতটুকু সাহায্য করেছিলেন তা ইণ্টার-নেশনেল আইন বজায় রাখবার জন্তই। ইরানে চিফ জাস্টিসের শরীর ভেংগে যায়। হিন্দুপ্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করলেন "কি করে শরীর পুনরায় গঠন করা যায়।" সে প্রশ্নের উত্তর কি দেব আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। এদিকে ওদের কিছু বলাও দরকার। অগত্যা শরীর ভাল রাখার উপযুক্ত খাদ্য খেতে পরামর্শ দিলাম। কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোকেরা চেয়েছিলেন কোনও মন্ত্রশক্তির সাহায্যে তাদের যৌবন কয়েক মিনিটের মাঝেই ফিরিয়ে পেতে। বাংলাদেশের লোক সকলেরই যাদুবিদ্যা অল্পবিস্তর জানে—এই ছিল তাঁদের ধারনা এবং বাংগালীর মন্ত্রশক্তির প্রভাবে মানুষকে ছাগলে এবং ছাগলকে মানুষে পরিণত করতে পারে এটাও তাদের ধারণা ছিল। বস্ত্রব্যবসায়ী পাঠানরা নাকি এসব তাজ্জব ব্যাপার বাংলা মুলুকে স্বচক্ষে দেখে গেছে।

আশ্চর্যের বিষয় উভয় ভদ্রলোকই শিক্ষিত, নানা দেশের রাষ্ট্রনীতির সংগে পরিচিত, অথচ তাঁরা এরূপ মনোভাব পোষণ করেন দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম। তাঁদের বললাম "যে সকল কথা আপনারা সত্য বলে গ্রহণ করেছেন সেই কথা সত্য নয়, মন গড়া কথা মাত্র।" উভয় ভদ্রলোকই আমার কথায় দুঃখিত হলেন এবং আমাকে প্রসন্নমনে বিদায় দিতে পারেন নি।

সেদিনই বিকালবেলা মিঃ আবদুল্লার সংগে ফের দেখা করলাম এবং বাচ্চা-ই-সাক্কোর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে বললেন "বাচ্চা-ই-সাক্কো যখন পালিয়ে যান তখন তাঁরই চেষ্টায় বাচ্চা-ই-সাক্কো ধরা পড়েন এবং পরে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়।"

কাবুল শহর রাষ্ট্রনীতি আলোচনার একটি বিশেষ আড্ডা। কাবুলের একদিকে রুশদেশ এবং অন্যদিকে ইরান হতে তুর্কি পর্যন্ত মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের অধ্যুষিত দেশগুলি থাকায় রাজনৈতিক চর্চা ভাল মতেই চলে। এখানে বসে হিন্দুদের হৃৎকম্প সৃষ্টি করার মত বাক্য উচ্চারণ করার সুযোগ এবং সুবিধাও

পাওয়া যায়। এখানে বসেই অনেক রাষ্ট্রনৈতিক ভারতের ভবিষ্যত নিয়ে নানা রকম প্রবন্ধ রচনা করেন। পূর্বে এখানে বসেই অনেক বৈদেশিক ধনতান্ত্রিক চীনা-তুর্কিস্থানের উপর চালবাজি করতেন। কিন্তু সোভিয়েট রুশ সেই চালবাজিতে বাধা দিয়ে তুংগান সরদার মহম্মদকে খাসগার হতে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখন তিনি শ্রীনগরে বাস করছেন। এই কাবুলে বসেই একদিন আনোয়ার পাশার বোখারা আক্রমণের মতলব রচনা করা হয়েছিল। কাবুলও পৃথিবীর চালবাজির একটি কেন্দ্রস্থল। কাবুলের রুশ রাষ্ট্রদূত যখন তাঁর বাড়ী হতে বের হন তখন লোক অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকায়। আবার যখন একজন খর্বকায় জাপানী লাঠি হাতে করে গম্ভীর মুখে পথে পথে বেড়ান তখন হুঁশিয়ার লোক তানাকা মেমোরিয়েলের কথা স্মরণ করে কেঁপে ওঠে। ব্রিটিশ রাজদূত উদাসীর মত পৃথিবীর সকলকে উপেক্ষা করেন এবং কি ভাবেন কিন্তু তিনি যখন পথে বের হন তখন অনেকেই তাঁকে চীন-সম্রাটের সংগে তুলনা করে।

কে বলে কাবুলে প্রাণ নেই? ঢাক ঢোল বাজিয়ে আমোদ হয়। নীরব নিস্তব্ধতার মাঝেও ডিপ্লমেটিক চালবাজি দেখে আনন্দ পাওয়া যায়। ডিপ্লমেটিক চালবাজি দু রকমের। আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক। বাহ্যিক চালবাজিই সাধারণ লোক দেখতে পায়, আভ্যন্তরিক চালবাজি বুঝবার জন্য সাধারণ লোক চেষ্টাও করে না। আমি বাইরের চালবাজি দেখেই আনন্দিত হতাম।

জীবনের ঈপ্সিত দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে কাবুল শহরও একটি ছিল। কাবুল দেখা হয়ে গেলে একদিন ভাবলাম কাবুলের বৈদেশিক কনসালদের বাড়ী বেড়িয়ে আসলে ক্ষতি কি? এই বাড়ীগুলিও দ্রষ্টব্য স্থলসমূহের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে। কন্‌সালদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কারো কাছে হাত পাততে ইচ্ছা হয় নি, সেজন্যই বোধহয় সকল কন্‌সালই সাদর সম্ভাষণ করতে ত্রুটি করেন নি। একজন কন্‌সাল শুধু উপদেশচ্ছলে বলেছিলেন "আমি যদি রুশ দেশে যাই তবে খুবই ভাল হবে। আবার সংগে সংগেই বলেছিলেন

রুশ দেশে গেলে অন্য কোনও দেশের ভিসা পাওয়া মুশকিল হবে, অতএব ভাবা উচিত একদিকে সমগ্র পৃথিবী আর অন্যদিকে কেবলমাত্র রুশিয়া—এ দুএর কোন্‌টার আকর্ষণ বেশী। আমি জানতাম পারেয়ারী বলে এক ফরাসী ভূপর্যটক বাইসাইকেলে রুশ দেশের এক সীমান্ত হতে অন্য সীমান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর সংগে আমার দেখা হয়েছিল সাইগনে। তিনিই আমাকে বলেছিলেন রুশরা যেভাবে পর্যটকদের সাহায্য করে, পৃথিবীর আর কোন জাতই তেমনটি করে না। সাইগনে সর্বসাধারণের কাছে যখন তিনি তাঁর ভ্রমণ-কথা বলতেন তখন রুশদেশের কমিউনিজমের প্রশংসা করতেন। রুশ দেশের কমিউনিজমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করাও তখনকার দিনে পাপ বলে গণ্য হত, সেজন্য তাঁর মনের পরিবর্তনের ব্যবস্থা হয়েছিল। ফরাসী পর্যটক পারেয়ারী কোন মতেই নিজ মনোভাবের পরিবর্তন করতে সক্ষম হন নি। সেইজন্যই অন্তত আমি যতদিন সাইগনে ছিলাম ততদিন তিনি ফরাসী ইন্দোচীন পরিত্যাগ করতে সক্ষম হন নি। এতটুকু জেনে শুনে রুশ দেশে যাওয়াটা আমার কাছে খুব ভাল বলে মনে হল না। রুশিয়ায় যাওয়ার কথা উঠলেই বিষয়টাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করতাম। এক্ষেত্রেও তাই করলাম।

বৈদেশিক কন্‌সালগণ সকল সময়ই অপরের মনে কি আছে না আছে জানতে চেষ্টা করেন, জিজ্ঞাসু কন্‌সালদের সে ফুরসত দিলাম না। সমস্ত পৃথিবীতে সোভিয়েট রুশিয়াকে ধ্বংস করার মতলব আঁটা হচ্ছিল, আমি কেন তাতে যোগ দেব? কোন ভ্রমণকারীর পক্ষে অন্যের অনিষ্ট কামনা করাও অন্যায়। এই ধারনা পোষণ করেই সোভিয়েট রুশিয়া সম্বন্ধে নীরব থাকতাম।

আমানউল্লা

আমানউল্লা সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া ভ্রমণ এ কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা আমি জানি এবং সকলেই অবগত আছেন তবুও আমানউল্লা সম্বন্ধে কিছু বলতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ আমানউল্লাকে অসাধারণ মানুষ বলতেই হবে। আমানউল্লা রাজারূপে আমার কাছে অসাধারণ মানুষ নন, মানুষরূপে অথবা সাধারণ মানুষরূপে বিশেষত্ব অর্জন করেছেন। সেই বিশেষত্ব কোন দিক দিয়ে সকলেরই জানবার ইচ্ছা হবে। আমানউল্লার অসাধারণত্ব অতীব নূতন ধরণের যাহা সহজে সকল মানুষের কল্পনারও বাইরে। বর্তমানে আমানউল্লা ইতালীর রোমে অবস্থান করছেন। একদা আফগানিস্থান বৃটিশের অধীন ছিল, আমানউল্লাই সেই পরাধীন দেশকে স্বাধীন করেছিলেন, তারপরও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আফগানিস্থানে অনেক রকমের কুট-নীতির চাল চেলেছে এবং এখনও যে আফগানিস্থান হতে হাত ধুয়ে চলে গেছে বলা চলে না। আফগানিস্থান ও বিদেশীক রাষ্ট্রনৈতিক চালিয়াৎদের হাত থেকে রক্ষা পাবে সেই আশা বৃথা। রাজতন্ত্র ধনতন্ত্র ইত্যাদি বজায় রাখতে হলে আফগানিস্থান বৈদেশিক ধনতান্ত্রিক দেশগুলির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা অসম্ভব। আফগানিস্থানের চারিদিকে যেসকল রাজ্য আছে সেই দেশগুলির মধ্যে শুধু রুশ এবং চীন দেশই গণতান্ত্রিক। অন্য দুই দিকে বর্তমানে যে দুটি দেশ রয়েছে সেই দেশ দুটিতে শুধু ধনতন্ত্র কায়েম নাই, ইচ্ছাতন্ত্রেরও প্রাচুর্য দেখা যায়। অবশ্য পাকিস্থান সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য চলে না। পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র এখনও গড়ে উঠে নি। পাকিস্থানে কিরূপ গঠনতন্ত্র হবে এখনও জানা যায় নি। তবে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যেহেতু, পাকিস্থান ইণ্ডিয়ারই অংশ ছিল সেজন্য ইণ্ডিয়াতে যেরূপ শাসনতন্ত্র প্রচলিত হবে পাকিস্থানেও সেরূপই হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু পারস্যে এখনও যথা পূর্বং তথা পরং

ব্যবস্থা। বাহাইদের স্থান পারস্যে নাই, সিয়া এবং সুন্নিতে যে পার্থক্য ছিল অনেকটা এখনও বর্তমান। উন্নতিকামী দল বিধ্বস্ত এবং ধনতান্ত্রিকরা শক্তিশালী।

এরূপ অবস্থায় আফগানিস্থান কোনও প্রকারে স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছে সেজন্য বর্তমান আফগান সরকারকে ধন্যবাদ দেওয়া চলে। অবশ্য এর মধ্যে একটি কথা আছে। আফগান সরকার বর্তমানে "বাফার" ষ্টেটের কাজ করে যাচ্ছে। যেমন করেছিল এবং করছে ইউরোপের সুইজারল্যাণ্ড। সুইজারল্যাণ্ড এবং আফগানিস্থানের মধ্যে আর্থিক এবং সামাজিক পার্থক্য আকাশ পাতাল। নিজের দেশকে সুইডিশরা আধুনিক সভ্যতার আওতার মধ্যে এনেছে, আফগানিস্থান পূর্বে যেমন ছিল তেমনি রয়েছে।

আমানউল্লা আফগানিস্থানকে সুইজারল্যোণ্ড পরিণত করতে চেয়েছিলেন, বৃটিশ বৈরী হয়ে তাঁকে দেশত্যাগী করেছিল। আফগানিস্থান যদি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হয়ে দক্ষিণ এশিয়াতে নিজের নাম অর্জন করতে পারত তবে ইণ্ডিয়া দ্বিখণ্ডিত হবার সম্ভাবনা ছিল না। বৃটিশ বড়ই চতুর। আমরা যাহা আজ চিন্তা করি বৃটিশ সেই চিন্তা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে করে।

শোনা যায় আমানউল্লা অল্প বয়সেই ভারতীয় বিপ্লবী-সুলভ-মনোবৃত্তিও অর্জন করেন। আমরা যাকে ধর্ম বলি আমানউল্লা সেই বিষয়টারই সমালোচনা করেন প্রথম। ধর্ম সমালোচনা করে বুঝতে পারেন আমরা যাকে ধর্ম বলি বাস্তবিক পক্ষে তাহা ধর্ম নয়, মতবাদ মাত্র। ধর্ম সম্পুর্ণরূপে এক পৃথক তথ্য, মহম্মদ কথিত কোরাণ মহম্মদের মতবাদ মাত্র, যিশুখৃষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য অবতারগণ যাহা বলেছেন সবই তাঁদের মতবাদ। মতবাদ অবশ্য পালনীয় বিষয় নয়। হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণের কথিত গীতা মেনে চলে, মুসলমানেরা মানে না; তা'বলে মুসলমানেরা কি জাহান্নামে চলে গেছে! এর জন্য কেহই জাহান্নামে যায় না এবং যাবেও না।

কিন্তু ধর্ম কেহই পরিত্যাগ করতে পারে না। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে কি কোনও মানুষ বাঁচতে পারে? মিথ্যা গল্পে অর্থাৎ মাইথোলজীতে অনেক কাহিনী আছে যে অমুক লোক এত হাজার বৎসর না খেয়েও বেঁচে ছিলেন। মাইথোলজীর তুলনা সেই ধরণের গালগল্প পুস্তকেই বর্ণিত হয়েছে কিন্তু এটা সত্যকথা, না খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। বুদ্ধ কয়েক দিনের জন্য খাদ্য ছেড়ে দেবার পর যখন বুঝতে পেরেছিলেন উপবাস করলে মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তখন তিনি খাদ্য গ্রহণ করেন। তাঁকে খাদ্য গ্রহণ করতে দেখে তাঁর কয়েক-জন শিষ্য তাঁর সংগ পরিত্যাগ করেছিল। এতে তিনি একটুও কাতর হন্ নি।

এই ধরণের অবতারবাদী বিপ্লবাত্মক আলোচনাতেই আমানউল্লার যৌবনের অনেক বৎসর কেটেছিল। আবদুল্লা, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, লালা লাজপত রায়, এই ধরণের বিপ্লবীদের সংগে আমানউল্লা ভাবের আদান-প্রদান করতে পেরেছিলেন।

নূতন চিন্তাধারায় উদ্ভাসিত হয়েই দেখলেন দুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাইল রাজ্য বর্বর এবং অশিক্ষিতদের দ্বারা অধ্যুষিত। মোল্লারা পরোক্ষ শাসন এবং শোষণ করছে এবং মোল্লাশ্রেণীর লোক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে উৎকোচ পেয়ে যা ইচ্ছা তাই করে যাচ্ছে।

আমানউল্লার পিতা পুরোপুরি বৃটিশের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ ১৯১৭ খৃঃ অঃ রুশিয়াতে বিপ্লব হবার পর আফগানিস্থানের নিকটস্থ সোভিয়েট ষ্টেটগুলিতে অনেক রকমের আন্দোলন, গোলমাল, মারামারি কাটাকাটি চলতে থাকে। হবিবুল্লা হয়ত ভেবেছিলেন যদি তাঁর রাজ্যেও সেরূপ অঘটন ঘটতে আরম্ভ করে তবে বৃটিশ সরকার এক থাবায় আফগানিস্থান কেড়ে নেবে।

হবিবুল্লার বৃটিশ প্রীতি সকলের সহ্য হয় নি। কতকগুলি তথাকথিত দেশপ্রেমিক লোক বিশেষ করে হবিবুল্লার আত্মীয়েরা তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টায় অগ্রণী হয় এবং নাসেরউল্লাকে শাসকরূপে গ্রহণ করতে মনস্থ করে। নাসেরউল্লা

আমীর হবিবুল্লার সাক্ষাৎ ভাই। বোধহয় অর্থাৎ কেহ কেহ মনে করেন নাসেরউল্লা এই হত্যাকার্যে পরোক্ষ সমর্থক ছিলেন।

প্রশ্ন জাগে কেন রাজাকে হত্যা করে রাজভ্রাতাকে রাজ্য দেওয়া হবে? উত্তরে বলা যেতে পারে আফগানিস্থানে অনেক ভারতীয় বিপ্লবী আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাঁরা মনে করেছিলেন যে কোনও প্রকারে যদি আফগানিস্থানে কিছু ঘটাতে পারা যায় তবে ভারতেও বিপ্লবের প্রভাব বৃদ্ধি হবে। মোল্লা শ্রেণীর লোক কিন্তু হবিবুল্লার হত্যার জন্য একটুও উস্কানি দেয় নি, সেজন্য আফগানিস্থানের মোল্লাশ্রেণীকে বৃটিশের স্পাই বলতেও অনেকে কসুর করত না।

হবিবুল্লাকে হত্যা করার পর নাসেরউল্লারই রাজা হবার কথা ছিল কিন্তু আমানউল্লা পিতৃ-সিংহাসন পরিত্যাগ না করে নিজেই সিংহাসন দখল করেন. সেইজন্য অনেকে মনে করেন আমানউল্লাও তাঁর পিতৃহত্যাতে সংযুক্ত ছিলেন। এই প্রকারের ধারণা স্বদেশী এবং বিদেশী কয়েকজনের ধারণা মাত্র। কাবুলের হিন্দুরা এই ধারণাকে একটুও বিশ্বাস করতেন না এবং যখনই হাবিবউল্লার মৃত্যুর কারণ অন্বেষণ করতে কেহ চেষ্টা করছেন সব সময়ই আমানউল্লাকে বাদ দিয়ে কথা বলেছেন।

যখন হাবিবুল্লা নিহত হন তখন আমানউল্লা সহরের বাইরে শিকারে গিয়েছিলেন। আরও একদল লোকের মুখে শুনেছি হবিবুল্লার মৃত্যুর জন্য আমানউল্লাও অনেকটা দায়ী। কারণ তখন দেশের মধ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করতে চাইছিল হাবিবুল্লা তাদের কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন, আমানউল্লা সেই দমনকার্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। শুধু তাই নয় হিজ্ হাইনেস্ দি আমীর অফ্ আফগানিস্থান বেশ ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে বিপ্লবের পেছনে মোল্লাইজম নাই সেই বিপ্লব বড়ই মারাত্মক এবং তাকে দমন করা অতীব কঠিন কাজ।

হবিবুল্লার হত্যার পর আমানউল্লা নিজেই রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং বিপ্লবীদের সাহায্যে বৃটিশ অধিকৃত উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের পেছনে অভিসন্ধি ছিল। ভারতীয় বিপ্লবীরা আমানউল্লাকে ভারতের সম্রাট ঘোষণা করেন এবং আফগানিস্থানের বিপ্লবীরা পাঠান অধিকৃত এলাকা উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ করায়ত্ব করার জন্য বদ্ধপরিকর হন্ কিন্তু এটা জানবার কথা অবশ্য সকলের কাছে নয়, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের লোকের মধ্যে শিক্ষা না থাকায় সেই এলাকার লোক কতকগুলি কমিউনিটিতে বিভক্ত ছিল এবং এক কমিউনিটি অন্য কমিউনিটিকে আক্রমণ করত, অবস্থা ছিল ফিউডেলইজম। ফিউডেলইজমের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের শাসন করা অতি সহজ, কারণ তাদের আত্মরক্ষা করার ক্ষমতাও কম। বৃটিশ প্রচারের ফলে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ বিপজ্জনক এলাকাতে পরিগণিত হয়েছিল বটে কিন্তু যে কোনও অরগেনাইজড্ সৈন্য যে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশকে করায়ত্ব করার ক্ষমতা রাখত তা বৃটিশ ভাল করেই জানত।

উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশকে ভয়াবহ করে রাখারও একটি কারণ ছিল। সেই কারণ হ'ল ভারতীয় অর্থে কতকগুলি বৃটিশ পল্টনকে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে প্রতিপালিত হবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় বড় বড় হিন্দু রাজারা তাই মনে করতেন এবং অম্লানবদনে বৃটিশ কার্যাবলী সমর্থন করে যেতেন। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থানের দুর্বল আর্থিক অবস্থা এবং অধিবাসীর মানসিক দুরাবস্থা বৃটিশ শাসকশ্রেণী জনাত কিন্তু যখনই শুনতে পাওয়া গেল উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তবাসীদের মধ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে তখন বৃটিশ বিষয়টা মোটেই মেনে নিল না। ভারতের হিন্দুরা চিন্তিত হ'ল এবং বৃটিশ সরকারকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। বৃটিশ কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে দিল আফগানদের আক্রমণের প্রক্রিয়া দেখতে। যখন বৃটিশ দেখতে পেল সত্যই আফগান এবং সীমান্তবাসীরা বৃটিশের কয়েকটি ঘাঁটি আক্রমণ করছে

তখন আর চুপ করে থাকা নিরাপদ মনে না করে আন্তর্জাতিক নিয়মমত আফগান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং ভারতের রাজন্যবর্গের সমর্থন লাভ করল।

ইংলণ্ড এবং আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলি চিৎকার করে বলতে লাগল "গেল রাজ্য গেল মান।" এই সময়ে বাংলা দেশের যত সাপ্তাহিক এবং দৈনিক সংবাদপত্র ছিল বৃটিশকে সমস্বরে চিৎকার করে সমর্থন করে। বাঙ্গালী মুসলমান পরিচালিত মহম্মদী এবং লাহোরের কয়েকখানা সংবাদপত্র অতীব গাম্ভীর্যের সহিত বাজে কথা বকতে আরম্ভ করে। তাদের ধারণা ছিল আমানউল্লা সত্বরই দিল্লী পর্যন্ত মার্চ করে পৌছতে পারবেন। বৃটিশ জানত পাতিয়ালার মহারাজা যদি ইচ্ছা করেন তবে মারাঠা সৈন্য হটিয়ে দিয়ে পনর দিনের মধ্যে কাবুল পর্যন্ত পৌছতে পারতেন। সেজন্য পাকা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ধীরে অগ্রসর হ'তে থাকে। ভারতীয় সৈন্য পাঠান, কোহাট, থাল প্রভৃতি স্থানে মামুলী বাধা প্রাপ্ত হয়। তারপর ভারতীয় সৈন্য ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের খান্‌দের তারা যেমন ছিল তেমনি থাকতে আদেশ দিয়ে উত্তম পথে ভারত-সীমান্তে পৌছে।

এখানেই যুদ্ধের শেষ হবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু আমানউল্লা ইচ্ছা করেই যুদ্ধ করতে থাকেন। আমানউল্লা এক কোটি লোকের অধিপতি ছিলেন কিন্তু সেই এক কোটি লোক এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল না, দ্বিতীয়তঃ মোল্লারা এই যুদ্ধের পক্ষপাতী না থাকায় সামান্য ক্ষয় স্বীকার করে বৃটিশ সৈন্য জালালাবাদ পৌছে। ঠিক সেই সময় আমানউল্লা বৃটিশকে হুমকী দিয়ে জানিয়ে দেন, আর অগ্রসর হলে তিনি সোভিয়েট রুশের সাহায্য নিতে বাধ্য হবেন। বাস্, এখানেই যুদ্ধের শেষ।

লয়েড জর্জ বিশেষ করে সোভিয়েট রুশিয়ার শক্তি অবগত ছিলেন। কোনরূপ বাক্যাড়ম্বর না করে বৃটিশ সরকার নিজের সৈন্য সীমান্তে অপসরণ

করে এবং আফগানিস্থানের হিন্দু জেনারেল নিরঞ্জন সিং এমনই একটি চাল দেন যার সাহায্যে আফগানিস্থান স্বাধীন রাজ্য বলে স্বীকৃত হয় এবং আমানউল্লা আফগানিস্থানের প্রথম রাজা স্বীকৃত হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

আমানউল্লার রাজত্বকালে অদম্য উৎসাহ নিয়ে সামাজিক উন্নতি হতে থাকে। হিন্দুরা অনেক দিক দিয়ে সরকারী সাহায্যে নিযুক্ত হয় এবং উপজাতিদের মধ্যে নব-জীবনের সঞ্চার হতে থাকে। চারিদিকে উন্নতির লক্ষণ সর্বত্র লক্ষিত হয় কিন্তু মোল্লা এবং মৌলবী শ্রেণীর লোক যেন কিছুতেই নাই এটাও লক্ষিত হচ্ছিল।

সিংহাসন লাভ করার পর আমানউল্লা বিদেশে যান নি। সেজন্য তাঁর বিদেশ দেখা সমূহ দরকার মনে করেন এবং ইউরোপ ভ্রমণে বাহির হন। সংগে যান তাঁর স্ত্রী সুরিয়া। সুরিয়া পর্দা হতে মুক্ত হয়ে সভ্য সমাজের রাজ-পরিবারগুলির সহিত মেলামেশা করতে থাকেন। ইংলণ্ডের পত্রিকাগুলি অত্যধিক উৎসাহী হয়ে রাণী সুরিয়ার ছবিসমেত সকল বিষয় ছাপাতে আরম্ভ করে। পৃথিবীর সাধারণ লোক মনে করতেছিল কি আনন্দের সংবাদ! একটি পশ্চাদপদ জাত ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে। এদিকে রাজা আমানউল্লার অবর্তমানে মোল্লারা প্রচুর স্বর্ণমুদ্রার মালিক হয়ে সাধারণ লোককে ক্রমাগত উস্‌কাণী দিতে থাকে এবং তার ফলে রাজ্যের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়। রাজা আমানউল্লা মস্কোএর পথে কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাজ্যের দারিদ্র্য এবং বিশৃঙ্খলতা দূর করতে মন দেন।

বাচ্চা-ই-সিক্কা নামে একটি লোক তখন জেলে ছিল। জেলের লোক তাকে বেশ ভাল লোকই মনে করত এবং তার আদেশে অনেক কাজও করত। বাচ্চা-ই-সিক্কা প্রায়ই মশক দিয়ে জল বহন করে মানুষের বাড়ীতে দিয়ে আসতেন। এতেই তাঁর আহারের বন্দোবস্ত হয়ে যেত। তখনকার আফগান জেল-আইন মতে কয়েদীকে খাদ্যরূপে কিছুই দেওয়া হ'ত না অথবা এমনই সামান্য

কিছু খাদ্য দেওয়া হ'ত যার দ্বারা মোটেই তার পেট ভরত না। সেজন্য কয়েদীরা বাইরে যাওয়া আসা করতে পারত।

মোল্লারা বিদেশীর কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে বেশ মজা লুটছিল কিন্তু তখন এমন একটি লোকের সন্ধান পাওয়া যায় নি যে আমানউল্লার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে পারবে। অবশেষে এক দিন বাচ্চা কোনও মোল্লার বাড়ী হতে রুটি আনার সময় মোল্লার সংগে কথা বলতে আরম্ভ করে এবং আমানউলার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে সেরূপ মনোভাবও প্রকাশ করে। বাচ্চা-ই-সিক্কা মোল্লার কাছ থেকে কিছু বৃটিশ স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে জেলের মধ্যে এসেই দল পাকাতে আরম্ভ করে। তখন একটি স্বর্ণমুদ্রার দাম প্রায় পঁচাত্তর আফগানী ছিল। পঁচাত্তর আফগানী একটি স্বর্ণমুদ্রায় যেখানে পাওয়া যেত সেখানে যদি কারো কাছে একশত স্বর্ণমুদ্রা থাকত তবে তাকে মস্তবড় একজন ধনী ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? এত টাকা পেয়েও বাচ্চার মাথা খারাপ হ'ল না, তার মনে বড় হবার বাসনার উদ্রেক হল। সে মনে করল ইচ্ছা করলেই রাজা হওয়া যায়। সর্বপ্রথম জেলের মধ্যেই বাচ্চা কাজ আরম্ভ করে দিল—জেলের মধ্যে আরম্ভ হ'ল গোপনে আলোচনা। সেই সময় কয়েকজন হিন্দুও জেলে ছিল। হিন্দুদের কেউ চিনতে পারত না এমন কি হিন্দুরা কেহ হিন্দু বলে পরিচয় দিত না। কোনও পর্যটক বলতে ইচ্ছুক নন। কুকথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। পৃথিবীতে বর্বর যুগ তখনও ছিল এবং এখনও যে নাই তা বলা চলে না। এখনও এমন অনেক লোক আছে যারা অবতারবাদের অন্ধ বিশ্বাসে নরহত্যা করতে অগ্রসর হয়। এই বর্বরগণ যদি জানত তাদের পূর্ব-পুরুষ কত দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে এই পৃথিবীতে মানুষের প্রাধান্য অর্জন করেছেন তবে অবতার-বাদকে ঠেলে ফেলে দিয়ে মানুষের উন্নতিবাদই আকড়িয়ে ধরত।

একদিন দেখা গেল একটা টিকিধারী লোক আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। আর কি রক্ষা আছে? অন্যান্য কয়েদীরা সেই লোকটাকে আক্রমণ করল।

যখন সে বুঝতে পারল তার বাঁচবার আর কোন উপায় নাই তখন সে সাক্কোর পা জড়িয়ে ধরল। বাচ্চা-ই-সাক্কোর ইঙ্গিতে সবাই সরে দাঁড়াল। লোকটাও বেঁচে গেল। এর নাম চেলারাম। কাংড়া জেলাতে এর বাড়ী ছিল। বাচ্চা-ই-সাক্কো চেলারামকে সাহায্যকারী পেয়ে সুখী হয়েছিল এবং চেলারামও বাচ্চা-ই-সাক্কোকে বন্ধুরূপে পেয়ে স্বাধীন ভারতের চিন্তা করতে পারছিল।

যৌবনের প্রথমাবস্থায় চেলারাম কলিকাতা আসে এবং প্রথম মহাযুদ্ধে সেপাই হয়ে ইরাকে যায়। ইরাকে ইরাকীদের হালচাল দেখে তার মন দমে যায় এবং ডিস্‌চার্জ হয়ে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে মোটর ড্রাইভারের কাজ আরম্ভ করে। আফগান যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে সে আফগানিস্থানে যায় এবং মোটর একসিডেন্ট করার জন্য জেল হয়। চেলারাম আফগানিস্থানের জেলের অবস্থা জানত না, দ্বিতীয়ত সেখানকার হিন্দুদের সংগেও মিলামিশা করত না, সেজন্যই সে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল। চেলারাম মনে করত আফগানিস্থান অনেক উন্নত হয়েছে কিন্তু আলোর কাছেই ঘন অন্ধকার এ ধারনা সে করতে পারে নি। এই সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা কান্দাহার অধ্যায়ে কিছু বলেছি।

চেলারাম ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল তথাকথিত ধর্ম এবং বর্তমান অর্থ-নীতি মানুষের শত্রু। কিন্তু সে জানত না তথাকথিত ধর্ম এবং বর্তমান অর্থ-নীতির আওতা হতে কি করে রক্ষা পাওয়া যায়। মূর্খ হয়েও সে পণ্ডিতের মতই কাজ করে চলল। বিদ্রোহ কি করে করতে হবে সেই সম্বন্ধে যখনই আলোচনা হ'ত তখন সেও থাকত। অন্যান্য হিন্দু কয়েদীরাও যোগ দিত। হিন্দু কয়েদীরা জেলে স্বাধীনতা পেয়েছিল।

অবশেষে বিপ্লব আরম্ভ হয়। বিদ্রোহ বিদেশী সৈন্য মুকতি পোশাকে যোগ দেয়। প্রথমত আমানউল্লা জয়ী হতে থাকেন পরে মুকতী সৈন্যের সাহায্যে বিদ্রোহীরা বিজয়ী হয়। আমানউল্লা কান্দাহারে পলায়ন করেন। হিরাতের সুবেদার কান্দাহার আক্রমণ করার পূর্বেই আমানউল্লা চামন হয়ে বম্বে

আসেন এবং ইটালীতে চলে যান। এখনও আমানউল্লা ইটালীতেই বসবাস করছেন।

সাম্রাজ্যবাদ বড়ই নির্মম। যে সাম্রাজ্যবাদ বাচ্চা-ই-সাক্কোকে রাজা করল সেই সাম্রাজ্যবাদ বাচ্চা-ই-সাক্কোকে পরে অনুপযুক্ত বলে মনে করল। নাদীর সাহ ফ্রান্সে ছিলেন। তিনি উপজাতির সাহায্য নিয়ে বাচ্চা-ই-সাক্কোকে পরাজিত করেন। বাচ্চা-ই-সাক্কো পালাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সক্ষম হন নি। কাবুলে এনে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনা ১৯২৯ সালের শেষের দিকে ঘটে।

নাদীর সাহও প্রগতিশীল মোল্লাবিরোধী ছিলেন। সাড়ে তেরশত বৎসর পূর্বে আরবদেশ যেমন ছিল মোল্লারাও ঠিক তেমনি থাকতে চায় সেজন্যই বোধহয় ফুটবল মাঠে যখন নাদীর সাহ পুরস্কার বিতরণ করতে ছিলেন আততায়ী সেই সময় তাঁকে হত্যা করে। এই ঘটনা ১৯৩৩ সালের ৮ই এপ্রিল ঘটেছিল। ঐতিহাসিকগণ এর বেশি কিছুই বলতে ইচ্ছা করেন নি। সেজন্য আমিও এখানে সংক্ষেপে আফগান ইতিহাসের কিছুটা বলে ফেল্লাম।

কাবুল হতে বিদায়

কাবুলে যা দেখবার সবই দেখেছিলাম, যা শুনবার শুনেছিলাম, এবার আমার প্রবল বাসনা হল কাবুল ত্যাগ করবার। কাবুল হতে গজনি পর্যন্ত ভূমি পর্বতময় ত বটেই, উপরন্তু বরফ পড়ে পথ অনেকস্থানেই বন্ধ ছিল। মাত্র ডাক চলাচলের সুবিধা ছিল; তাই প্রধান মন্ত্রীকে বলে ডাকের মোটরেই কান্দাহার যাবার বন্দোবস্ত করেছিলাম। অতি অল্প পরিশ্রমেই কাবুল পরি-ত্যাগের বন্দোবস্ত হয়েছিল।

এক সুন্দর প্রভাতে বহু প্রত্যাশিত কাবুল শহরকে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে আবার নতুন পথে যাত্রা করলাম। যে মোটরে রওনা হয়েছিলাম তার নাম হ'ল "মটরে পোস্ত"। শহর হতে বের হয়েই বুঝতে পারলাম তখন কাবুল পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে। যে দিকেই দৃষ্টি যায় সে দিকই বরফে সাদা হয়ে ছিল। সোঁ সোঁ করে প্রবল বাতাস বইছিল। আমার যত শীতবস্ত্র ছিল সব কটাই শরীরে জড়িয়েও শীতে থর থর করে কাঁপছে ছিলাম। তবুও কাবুলে ফিরে যেতে আর মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না।

পার্বত্যপথে মোটর অতি কষ্টেই চলছিল। অনেকবার পিছলপথের বাইরে মটর চলে যাচ্ছিল এবং চাকা বরফে ডেবে যাচ্ছিল। সুখের বিষয় আমাদের সংগে শাবল ও কোদাল ছিল। প্রত্যেকটা চাকাও চেন জড়ান ছিল। এতেও যখন মাঝে মাঝে মোটর পিছলে রাস্তার বাইরে চলে যাচ্ছিল তখন চেন না থাকলে আমাদের কি অবস্থা হ'ত তা সহজেই অনুমেয়। পথে কয়েকটি হিন্দু বস্তি পড়ছিল। ড্রাইভারের প্রতি সরকারী আদেশ ছিল, পথের মাঝে যে কোন হিন্দু বস্তি পড়বে সে আমাকে যেন তা দেখিয়ে যায়।

প্রথমদিন বিকালবেলা আমরা একটি হিন্দু বস্তিতে পৌছলাম। এই বস্তির লোকজনদের দেখে আমার মনে হল না যে এরা হিন্দু, এমন কি পাঠান।

এদের শরীরের গঠন ঠিক স্বচদের মতই। লম্বা লালমুখো লোকগুলি যেন চলতি দুনিয়ার কোন ধারই ধারে না। স্তারেমসে, নমস্কার, সেলাম আলেকম ইত্যাদি কোন শব্দই তাদের মুখে শুনলাম না। এরা যে ভাষা বলে তার একটা শব্দও আমার বোধগম্য হল না।

গ্রামের কয়েকটি লোক বরফ পরিষ্কার করছিল এবং অদূরে কতকগুলি লোক একটা উটের মাংস ভাগাভাগি করছিল। ওদের সংগে মোটর ড্রাইভার ইরানি ভাষায় কথা বলছিল। ড্রাইভার আমাকে বুঝিয়ে দিলে, যদিও এরা হিন্দু বলেই পরিচয় দেয় তবুও হিন্দুস্থানের হিন্দুদের সংগে এদের কিছুই মিল নেই। এরা সকল জানোয়ারেরই মাংস খায়। এদের জাত কোন মতেই যায় না। এরা সকল সময়ই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকে এবং কারো হুকুম মেনে চলতে রাজি নয়। পাঠানদের সংগে এদের কোনরূপ লেনদেন নেই। ইচ্ছা হয় খাজনা দেয়, যদি ভাল না লাগল তো গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। কাবুলের মত স্থানের গরমও এরা সহ্য করতে পারে না। এরা পর্বতবাসী। কারো কাছে আজ পর্যন্ত মাথা নত করে নি। উপহাস করে ড্রাইভার বললে এদের মাঝে হিন্দুপ্রীতি জাগাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। সুতরাং সেদিনই আমরা সেখান থেকে রওনা হয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই একটি ছোট গ্রামে পৌছলাম। গ্রামে সরাই ছিল, সেখানেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা হল।

সরাইএ আসবার পর মনে হল যেন একটা খোঁয়াড়ে ঢুকেছি। চারিদিকে উটের অর্দ্ধভুক্ত বিচালি এবং মলমূত্র বরফের সংগে মিশে জায়গাটাকে নরকে পরিণত করে তুলেছে। যে সকল লোক সরাইএ আশ্রয় নিয়েছিল তারা সবাই গরীব পাঠান। ওদের শীর্ণ মুখে পাণ্ডুর আভা। যে বস্ত্র সব পরে তারা শীত নিবারণ করছে তা অতি সামান্য। প্রত্যেকটি লোকের চোখেমুখে অসহায় ভাব। এরূপ লোকে ভরতি একটি ঘরের একাংশ দখল করলাম এবং সেই রাত্রি সেখানেই থাকতে বাধ্য হলাম। রাত্রে শুধু চা-রুটি খেয়েই থাকতে হল।

যে দোকানগুলি আটা, চাল ও ডাল বিক্রি করত তারা নেকড়ে বাঘের ভয়ে দোকান বন্ধ করেছিল।

রাত্রে সে ঘরে আলোর ব্যবস্থা ছিল না। অন্যান্য যারা ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল তারা ঘরের ভেতর হতে খড়কুটো জড় করে আগুন জ্বালাল এবং ছোট একটি অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি করল; সেই অগ্নির সাহায্যে আমরা একে অন্যের মুখ দেখে গল্প আরম্ভ করলাম। এত আজগুবি গল্প এরা বলছিল যে সেগুলো শুনে আমার ঘরে টিকে থাকাই দায় হয়ে উঠল। একজন বলছিল বাংগালীরা পৃথিবীর মধ্যে এক নম্বরের যাদুকরের জাত। ইচ্ছা করলেই যাকে তাকে ছাগল বানিয়ে রাখতে পারে। বাংগালীরা ছায়ামূর্তি ধারণ করে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যায়, এজন্যই বাংলাদেশে পথঘাটের কোন বালাই নাই। আমি বাংগালী একথা তারা জেনেছিল, সেজন্যই এসব গল্পের অবতারণা হচ্ছিল। তারপর উঠল আমারই কথা। একজন বললে এই মুসাফিরের কোন ভয় নেই। যখনই কোন বিপদ আসে তখনই সে বিপদ হতে রক্ষা পাবার জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়। বাংগালী পৃথিবী ভ্রমণ করবে না তো করবে কে? এরূপ নানাবিধ আলোচনার মাঝেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

পরদিন প্রাতে উঠেই চা রুটি খেয়ে আবার রওনা হলাম। আজ আমরা অন্ততঃপক্ষে ষাট মাইল না গেলে কোন গ্রাম পাব না—একথা ড্রাইভার মহাশয় গম্ভীরভাবে ঘোষণা করলেন। যে সব মাল আমাদের ব্যবহার করবার জন্য নামান হয়েছিল সেই সকল যথাস্থানে রেখে, খাবারের জন্য কয়েকখানা পরোটা কাগজে মুড়ে রওনা হলাম। পথে জলের বড়ই অভাব ছিল, পার্বত্য দেশের ছোট ছোট নদী নালাগুলির সব জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। শুধু পাতকুয়াতেই জল পাওয়া যেত। নিকটস্থ একটি পাতকুয়া হতে জল সংগ্রহ করবার জন্য মোটর থামল। পাতকুয়ার চারদিক বরফে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কুয়ার ভেতর যে বরফ পড়েছিল তা গলে গিয়েছিল। আমরা কেরোসিন টিনে পরিমান

মত জল ভর্তি করে ফের চল্লাম। একারকার পথ বড়ই উঁচু নীচু। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ চলেছে। ড্রাইভারের হাত ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুণ প্রত্যেক মুহূর্তেই ভাবছিলাম এই বুঝি গাড়ি পথ ছেড়ে নীচের দিকে চলল। সুখের বিষয় সেরূপ কিছুই ঘটে নি। ক্রমাগত পনের মাইল যাবার পর পথের পাশে একখানা পর্ণকুটির দেখতে পেয়ে মোটর দাঁড় করালাম।

ঘরখানি বড় নয়, মাটির দেওয়াল, উপরে মাটির ছাদ। দরজায় করাঘাত করা মাত্র ঘরের মালিক দরজা খুলে আমাদের বেশ করে দেখে নিলেন। বোধ হয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমরা সবাই সরকারী লোক। সেজন্যই বোধ হয় তিনি চায়ের বন্দোবস্ত করতে ইতস্তত করছিলেন কিন্তু যখন মোটর ড্রাইভার আমার পরিচয় করিয়ে দিল তখন তিনি ভেতর দিককার একটা কুঠরীর দিকে যেয়ে তাঁর স্ত্রীকে চা এবং খাবার তৈরি করতে আদেশ দিলেন।

প্রচুর চা, ডিম এবং শুকনো রুটি খেয়ে আমাদের বেশ তৃপ্তি হল। আমরাও গৃহের মালিককে প্রচুর পরিমাণে সিগারেট এবং চা উপহার দিয়েছিলাম। কুটিরবাসী পাঠান আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছিলেন, "বাংলা দেশ গরম আর এ দেশ ঠাণ্ডা। শীতের সময় এ দেশে ভ্রমণ করা বড়ই কষ্টকর।" ড্রাইভারকে তিনি বার বার এই বলে হুঁসিয়ার করে দিলেন যে বাংগালী মুসাফিরকে যেন শীত থেকে বাঁচিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌছনো হয়, গজনী পৌছবার পূর্বেই যেন ফ্রস্ট্-বাইট না হয়। দরিদ্র পর্ণ-কুটিরবাসীর আন্তরিকতা দেখে তার প্রতি আপনা হতেই মনে প্রীতির ভাব জেগে উঠেছিল।

আমাদের মোটরকার 'মটরে পোস্ত' হু হু করে এগিয়ে চলল। চা খাবার পর শরীর একটু গরম হয়েছিল কিন্তু নিমিষে তা লোপ পেল। আমি থর থর করে কাঁপতে ছিলাম। কয়েক মাইল পথ যাবার পরই মোটরকারের চাকা বরফকে বার বার ভেঙে যাচ্ছিল। অতি কষ্টে শাবলের সাহায্যে মোটরের চাকা

বরফ হতে মুক্ত করে আবার চলতে লাগলাম। এরূপ ভাবে চলার জন্য ঘণ্টায় পনের মাইলের বেশি আমরা এগুতে পারছিলাম না।

বিকালের দিকে আমরা ছোট একখানি গ্রামে পৌছলাম। এবার আমরা কোনও সরাই-এ না গিয়ে একজন গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হলাম। গৃহস্থ বড়ই দয়ালু। তিনি আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন। উত্তম খাদ্য দিলেন। শোবার জন্য প্রত্যেককে গরম বিছানা দিলেন। খাওয়া শেষ করে গরম বিছানায় আরাম করে বসবার পর গৃহস্বামী বললেন, এ পথ দিয়েই একজন ভারতীয় মোটর ড্রাইভার গজনী যাবার পথে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। জল এবং পেট্রোলের অভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়। বরফপাত শুরু হবার কয়েক দিন পর ঐ মোটর ড্রাইভার কাবুল হতে গজনীর দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন পথে জলের অভাব হবে না। কিন্তু পথ ঘাট ভাল রকম জানা না থাকায় জলের সন্ধান পান নি। পেট্রোলের উপর নির্ভর করেই তিনি অনেক পথ এগিয়ে যান। শেষটায় পেট্রোলও যখন ফুরিয়ে গেল তখন মোটর আপনিই বন্ধ হয়। মোটরের ভেতর নিরাপদ স্থান না থাকায় এবং আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না বলে রাত্রে যখন নেকড়ে বাঘের দল তাঁকে আক্রমণ করল তখন তিনি প্রাণ রক্ষা করতে পারলেন না। নেকড়ের দল শুধু রেখে গিয়েছিল তাঁর ছিন্ন বস্ত্র। ড্রাইভার যে ভারতবাসী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল চারিদিকে ছড়ানো পাশপোর্টের পাতা দেখে। অতঃপর গৃহস্বামী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন "আফগানিস্থান সুখ এবং দুঃখে পরিপূর্ণ। এখনও এদেশে সভ্যতার আওতা পুরোপুরি ভাবে আসে নি। রাজা আমানউল্লা সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। দেশ বিদেশের পুঁজিবাদীদের তা সহ্য হল না। তাদের অপচেষ্টার ফলে আজ হতভাগ্য ভারতীয় মোটর ড্রাইভারের অপমৃত্যু ঘটল। আমানউল্লা যদি তাঁর নির্ধারিত মতে রাস্তা তৈরীর কাজ করে যেতে পারতেন তবে প্রত্যেক বারো মাইল অন্তর একটি করে সরাই থাকত। কিন্তু তা হল না। আমানউল্লা চিরতরে দেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।"

করুণকাহিনী শোনার পর আর কোন কথাই ভাল লাগল না। সে দিনকার মত গৃহস্থের বাড়ীতে রাত কাটিয়ে পর দিন আমরা গজনীর দিকে রওনা হলাম। সুলতান মামুদের গজনী দেখবার জন্য প্রাণ উৎসুক ছিল। কিন্তু যা পথ! যখনই ড্রাইভার একটু অন্যমনস্ক হয়েছে অমনি গাড়ির চাকা বরফে ডেবে গেছে। আমাদের প্রাণপাত প্রয়াসে চাকা উঠিয়ে তারপর চলতে হয়েছে। সারাদিন পথ চলেও পথের শেষ হয় নি, রাত্রেও পথ চলতে হয়েছে।

চন্দ্র আকাশে উঠেছে। স্বচ্ছ, সুনীল আকাশে নক্ষত্ররাজি ঝকমক্ করছে। চতুর্দিকে পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র আলো বরফে আবৃত পার্বত্যভূমির উপর পড়ে এমন সুন্দর দৃশ্য সৃষ্টি করেছিল যা দেখে মনে হচ্ছিল এমন অপরূপ জ্যোৎস্নারাত্রি এ জীবনে আর কখনো দেখি নি। ভাবছিলাম আমি যদি কবি বা সাহিত্যিক হতাম তা হলে হয়তো এই সৌন্দর্য ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারতাম।

গজনী

গজনী এবং সোমনাথ পাশাপাশি চলছে। গজনীর নাম শুনা মাত্র যে কোন ভারতবাসী বলবে, "সেই গজনী যেখান থেকে সুলতান মামুদ সতেরবার সোমনাথ আক্রমণ করেছিলেন।" যদি কথাটি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ওঠে তবে অমনি দুঃখের কালিমা সকলের মুখে ফুটে উঠবে। মুসলমান যদি একই বিষয় আলোচনা করে তবে উদ্দীপনার ভাব দেখা দিবে। যেদিন কাবুল হতে কান্দাহার রওয়ানা হই সেদিন আমার মনে গজনী সম্বন্ধে কি ধারণা হয়েছিল তাই বলা ভাল, অন্যের কথা চিন্তা করে কি লাভ হবে।

ভাবছিলাম আসামাই মন্দিরের ভেতর দিয়ে যে নালা বয়ে যায় তাতে হিন্দু এবং মুসলমান বসন্ত হতে রক্ষা পাবার জন্য ঘোল ঢালে। এই দেশের লোকই গজনীর সুলতান ছিলেন। তারপর ভাবছিলাম আফগানিস্থানের যে দরিদ্র লোক না খেয়ে মরছে, তারা হিন্দু না মুসলমান? আগে বাঁচতে হবে তারপর ধর্মের প্রশ্ন। কিন্তু পুরোহিত, মোল্লা এবং পাদ্রী সেকথা মানুষকে ভাবতে দেয় না, পরজন্মের চিন্তায় ডুবিয়ে রাখে এবং তাদেরই সামনে ধরে তুলে সুলতান মামুদের মত ধর্মোন্মাদের বীরত্ব কাহিনী। আমার মনে গজনীর সুলতান অথবা সোমনাথ রেখাপাতও করতে পারছিল না। আমি ভাবছিলাম দেখতে হবে কি করে এদেশ হতে দ্রাবীড় সভ্যতা লোপ পেল, দ্রাবীড়গণ কি করে শ্বেতকায়দের সংগে মিশে গেল। যাকে ধর্ম বলে এত হাল্লা করা হয় সেটাও হল সেদিনকার সৃষ্ট কতকগুলি রীতি এবং নীতি। কিন্তু যখন ধর্ম বলতে কিছু ছিল না, যখন ছিল শুধু গোষ্টি তখন কি করে একে অন্যকে ধ্বংস করে জাতের সৃষ্টি করেছিল?

তারপর বর্তমান যুগ। বাস্তবিকই আফগানিস্থানের পাহাড়িয়া অঞ্চল স্বাস্থ্য-পূর্ণ স্থান। এদেশে কেন এখনও আর্থিক উন্নতি হয় নি? অথচ এরা

ইন্দো-এরিয়ান্। ইন্দো-এরিয়ান্‌রা সর্বত্র উন্নতি করেছে; এখানে কোন দোষে তারা একেবারে আদিমযুগে পড়ে আছে?

বাস্তবিক পক্ষে ভারতে নানা জাতের বাস। ভারতে দ্রাবিড়-কৃষ্টির প্রাধান্য ছিল। আফগানিস্থানেও দ্রাবিড়দের প্রাধান্য ছিল এবং সেখানেও দ্রাবিড় এবং ইন্দো এরিয়ান-এ মিশ্রণ হয়েছিল। তাই দেখছিলাম এবং পথ চলছিলাম। যখনই দেখতাম একজন ইংলিশম্যান্ পাজামা, কামিজ এবং মাথায় পাগড়ী বেঁধে খালি পায়ে বসে আছে তখনই ভাবতাম এরূপ কেন হয়? এরা ইংলেণ্ডের ইংলিশ না হয়ে মালা টপকাচ্ছে কেন? ভাবতাম এদের কাছে বোধহয় সাগর নেই সেজন্যই নরডিক্ হয়েও দ্রাবিড় সভ্যতার কাছে মাথা নত করছে। দ্রাবিড় সভ্যতায় আছে শুধু গঠন। কিন্তু ছিল না বিপ্লব এবং এখনও নেই বিপ্লব। আফগানিস্থানে অনেক যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যায়। সিয়া-সুন্নিতে যুদ্ধের ইতিহাস আছে, সুলতান মামুদের সোমনাথ আক্রমণের কথা আছে কিন্তু সামাজিক অন্তর্বিপ্লবের কোন নিদর্শন দেখতে পাই নি।

আমানউল্লা অন্তর্বিপ্লবের সূচনা করেন, বৃটিশ সেই অন্তর্বিপ্লব দাবিয়ে দেয়। এরূপ হল কেন? এটা কি দ্রাবিড়-সভ্যতার প্রভাব না আর কিছু? সিমেটিক সভ্যতার উপর দ্রাবিড় প্রভাব প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে এবং সেজন্যই আমরা মক্কাতে কাবা মসজিদ দেখতে পাই, এখানেও কি তাই? কাবুল হতে হিরাত পর্যন্ত বেড়িয়ে দেখলাম আমার ধারনাই ঠিক। যে সভ্যতা সিমেটিক সভ্যতার উপর প্রবল আঘাত করেছিল সেই সভ্যতা ও ইন্দো-এরিয়ান সভ্যতা এখানে এমনি আঘাত করেছিল যে সাংখ্য নামে প্রবল প্রতাপান্বিত দার্শনিকও সেই প্রভাব এড়াতে পারেন নি। অবশেষে বলেছেন, "কি জানি, এর পরে-ত কিছুই বলতে পারি না।"

অধিকরাত্রে আমরা গজনী পৌছলাম। কোথাও না থেমে সরকারী হোটেলের দরজায় গাড়ি থামানো হল, ইচ্ছা সেখানে রাত্রিবাস করা। গজনী

শহরের এটাই হল একমাত্র হোটেল। ফ্রেঞ্চ ধরনে পরিচালিত। আমার কাছে কাবুলের প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের চিঠি থাকায় হোটেলের ভাড়া বাবত কিছুই দিতে হয় নি। বাজার থেকে খাদ্য সংগ্রহের জন্য কয়েকটি মাত্র টাকা খরচ করতে হয়েছিল। খাবার আনবার জন্য হোটেলের বয়কে বাজারে পাঠালাম। ইত্যবসরে আমি জ্যোৎস্নালোকিত গজনী শহরের নয়ন মনোমুগ্ধকর নৈশ সৌন্দর্য উপভোগ করতে চেষ্টা করলাম।

কিন্তু পায়ের গোড়ালিতে এমন ব্যথা বোধ করতেছিলাম যে সৌন্দর্য উপভোগ বেশীক্ষণ করা চলল না। পা থেকে জুতাজোড়া পর্যন্ত খুলতে আমার কষ্ট বোধ হচ্ছিল। বয় খাবার নিয়ে ফিরে এলে তাকে পায়ের ব্যথার কথা বললাম। বয় খাবারগুলি টেবিলের ওপর ঢাকা দিয়ে রেখে একখানা ছুরি নিয়ে এল। তারপর সে ছুরির সাহায্যে জুতার ফিতাগুলি কেটে খুলে ফেলল। আগের দিন ফ্রস্ট-বাইট-এর কথা শুনেছিলাম। আজ বয় আমাকে শুনাল আমার পায়ে ফ্রস্ট-বাইট হয়েছে। কথাটা শুনামাত্রই পায়ের ব্যথা যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। চিন্তা হল হয়তো পা দুখানা চির জীবনের মত কেটেই ফেলতে হবে। ভ্রমণ হয়তো এ জীবনের মত এখানেই শেষ করতে হবে। আমাকে চিন্তিত দেখে বয় বললে, চিন্তা করবার কিছুই নেই। আমি এখনি ঔষধ আনছি। এই কথা বলেই বয় একটা বেসিনে করে খানিকটা ফুটন্ত জল এনে তাতে নুন মিশিয়ে দিল। জলটা যখন একটু ঠাণ্ডা হল তখন সে আমাকে গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখতে বলল। গরম জলে পা দুখানা ডুবিয়ে রাখার পর ব্যথা অর্ধেকটা কমে গেল। খাবার খেয়ে ফের জলে পা ডুবিয়ে রাখলাম।

যদিও বয় বেশ ভালভাবেই আমার পরিচর্যা করছিল কিন্তু তার মন ছিল পাপে পরিপূর্ণ। এমন অবস্থাতেও সে আমার কাছে কতকগুলি কুপ্রস্তাব করতে কুণ্ঠা বোধ করে নি। অর্থের অভাবই যে তার একমাত্র কারণ ছিল সে কথা আমি জানতাম।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মনে হল পায়ে ব্যথা আর নেই। আনন্দে বিছানা হতে নেমেই পোশাক-পরিচ্ছদ পরে সুলতান মামুদের কবর এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য দেখতে বের হয়ে পড়লাম। সুন্দর শাদা বরফের ওপর প্রভাত-সূর্যের আরক্ত রশ্মিমালা পড়ে চোখ ঝলসে দিচ্ছিল। রংগিন চশমা থাকায় সেই চোখ ঝলসানো সূর্যালোক আমার সৌন্দর্য উপভোগে ব্যাঘাত জন্মাতে পারছিল না। আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে একজন লোক সংগে নিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলাম।

অনেকগুলি পুরাতন ইটের স্তূপ, ভাংগাচোরা পাথর এবং স্থানে স্থানে ইমারতের ভগ্নাবশেষ দেখে মনে হল একদিন যা পরম যত্নে নৈপুণ্য সহকারে গড়া হয়েছিল তাই আর একদিন সময়ের পরিবর্তনে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আজ যা ভাল কাল তা মন্দ। আজ যিনি পূজিত কাল তিনি অবহেলিত। পুরাতন চিরকালই নূতনকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। আমি নূতনকে ভালবাসি। পুরাতন ধ্বংস হয়েছে বলে আমার মনে কোন দুঃখ ছিল না। যে শিবমন্দিরে হয়তো মুষ্টিমেয় কয়েকজন উপাসনা করত আজ সেস্থানে বিরাট মসজিদ সৃষ্টি হয়েছে। সহস্র সহস্র লোক সেখানে সেই ঈপ্সিত পরমারাধ্যেরই নাম উচ্চারণ করছে। ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডী ঘুচে গিয়েছে, তার পটভূমি হয়েছে বিরাট। পরিবর্তনকে এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বিচার করি। কোনো বিষয়েই সংকীর্ণতা আমার অন্তরের সমর্থন লাভ করে না। এটাও জানি অবতারবাদ চিরস্থায়ী নয়।

পাহাড়ের ওপর আছে একটি প্রকাণ্ড সমতল ভূমি। তারই ওপর পুরাতন একটা স্তম্ভ। স্তম্ভটি সুলতান মামুদ তাঁর জয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ গড়েছিলেন। স্তম্ভ-গাত্রে চিত্রকলার বহু নিদর্শন ছিল। চিত্র দেখে প্রাচীন দ্রাবিড় যুগের বলেই মনে হচ্ছিল। আরব সভ্যতার কোন ছাপ তাতে ছিল না। স্তম্ভটি দেখে মনে হল উন্নত শীর্ষে দাঁড়িয়ে থেকে এটি জয়ের বার্তাই ঘোষণা করছে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে যখন সুলতান মামুদের কীর্তিস্তম্ভ দেখছিলাম তখন একজন পাঠান বিক্রেতা

বাংলা ভাষায় আমাকে নমস্কার জানিয়ে বললেন "ঐ যে স্তম্ভটা দেখছেন এটা সুলতান মামুদ ভারত-বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।"

পাঠানকে প্রতিনমস্কার জানিয়ে বললাম "গজনী ভারতের বাইরে নয়। ভারতের ভেতরে থেকে ভারত-জয়ের স্মৃতিসৌধ গড়ে তুলবার কোন মানে
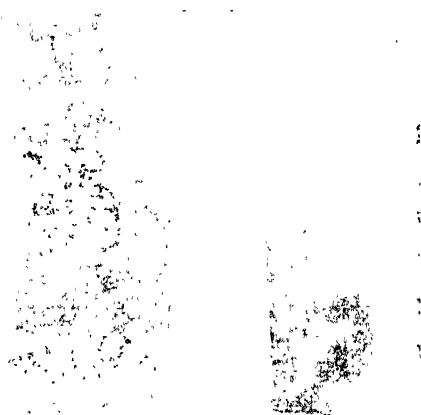
গজনীর সুলতান মামুদের স্মৃতিসৌধ

হয় না। আবার যখন নব প্রাণ-শক্তি নিয়ে নতুনের আবির্ভাব হবে তখন এই স্তম্ভকে নিশ্চিহ্ন করে আর একটা নতুন স্তম্ভ তৈরি হবে। পুরাতন আইডিয়া আজ যাকে জয়স্তম্ভের সম্মান দিচ্ছে, আগামী দিনের সেই নতুন আইডিয়া

তাকে হয়তো ধূলিসাৎ করে দেবে। আমানউল্লা ছিলেন নতুনের অগ্রদূত। তিনি নতুনের ভিত্তি পত্তন করে গেছেন মাত্র। আবার যখন নতুন এসে প্রচণ্ড আঘাত হানবে তখন পুরাতন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। আপনারা নতুনের জন্য অপেক্ষা করুন। আমার কথা শুনে পাঠান রুষ্ট হলেন না। আমার হাত ধরে নিকটস্থ মন্দিরে নিয়ে গেলেন।"

পুরাতন মন্দির—শিবের মন্দির। মন্দিরটি পাথরের আর শিবও পাথরের। মন্দির ও দেবতা আমার প্রাণে যে ভক্তিরসের সঞ্চার করল না, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঐ যে পূজারী ঠাকুরটি মন্দিরের একপাশে বসে গাঁজার কলকেতে দম দিচ্ছেন, তাঁকে দেখে আমার মনে প্রচুর কৌতুক রসের উদ্রেক হল। দীর্ঘকাল-ব্যাপী ইসলামিক প্রাধান্যের পরিচয়স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে সুলতান মামুদের যে জয়-স্তম্ভ তারই কাছে বসে গাঁজা ফুঁকাও বীরত্বের পরিচায়ক। গাঁজাখোরের সংগে কথা বলতে ইচ্ছা হল। কিন্তু গেঁজেলকে কথা বলতে খুব আগ্রহান্বিত বলে মনে হল না। যা হোক আমি যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম মন্দির সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য তিনি কিছু জানেন কি না? তখন তিনি পোস্ত ভাষায় জবাব দিলেন "সুলতান মামুদের জয়স্তম্ভের ইতিহাস আছে, কিন্তু এই শিবমন্দিরের ইতিহাস কিছুই নেই। মানুষের সভ্যতার সংগে সংগে এর জন্ম হয়েছিল এবং মানুষের ধ্বংসের সংগে সংগেই এরও ধ্বংস হবে।" গেঁজেলের কথায় হাসি পেল খুব কিন্তু শুনে যাওয়াই আমার কাজ। যা শুনেছি তাই যদি ঠিক মত বলতে পারি তবেই আমার কাজের পরিসমাপ্তি হবে।

প্রবল বেগে হাওয়া চারিদিকে বয়ে চলছিল। উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে থাকতে মোটেই ভাল লাগছিল না। শিবমন্দির দেখে ফেরবার কালে পাঠান আমাকে বললেন, আসুন এবার আমাদের গ্রামে যাই। পাঠানের গ্রামে গেলাম। পাঠান আমাকে একজোড়া হাতমোজা উপহার দিলেন এবং তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তাঁর সংগে কথা হল। পাঠান বললেন "গজনী শহরের কাহিনী

বড়ই বিচিত্র। এখানে অনেক বিদেশী এসে বসবাস করেছে বটে কিন্তু কেউ বেঁচে থাকতে পারে নি। পুরাতন অধিবাসীদের মাত্র কয়েকজন হিন্দুই টিঁকে আছে। আর অন্যান্য যাদের দেখছেন তারা অন্যান্য স্থান হতে এসে নতুন বসবাস করছে। কতবার যে এ শহরের লোক মরে উজাড় হয়েছে তার হিসাব করা যায় না। শেষবার যখন বরফপাতে গজনীর লোকক্ষয় হয় তখন এমনি ভাবে বরফ পড়েছিল যে, কেউ ঘরের চালের ওপরের বরফও পরিষ্কার করতে পারেনি। মাত্র একটি মুসলমান পরিবার বেঁচেছিল। আর বেঁচেছিল কতকগুলি হিন্দু। হিন্দুদের বাড়ীগুলি পাথরের ছিল তাই তারা রক্ষা পায়। যে মুসলমানটি বেঁচেছিল সে ছিল একজন কসাই। সে এক একটি করে দুম্বা কাটত আর তাই ছেলেদের খাইয়ে চালের ওপরকার বরফ পরিষ্কার করতে পাঠাত। এই করেই সে তার ঘর রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল।"

গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলিও রক্ষা পেয়েছিল। হিন্দুদের ঘরের ছাদ কখনও সমান থাকত না ক্রমশ উচু থাকায় বরফ আপনি গড়িয়ে পড়ত। হিন্দুদের অনুকরণে মুসলমানেরা ঘর তৈরী করত না। কি জানি হিন্দুর অনুকরণে ঘর করলে যদি ইসলাম ধর্মের ক্ষতি হয়। এখানেও মোল্লাইজমের ব্যভিচার ফুটে উঠেছিল।

যদিও গজনীর একটি হিন্দুও বরফপাতে মারা যায় নি তবুও হিন্দুর সংখ্যা অতি সামান্যই ছিল। অন্যস্থান হতে হিন্দুরা আসেও নি এবং হিন্দুদের সামাজিক কুপ্রথা পরিত্যাগ ও করে নি। মুসলমানেরা অন্যস্থান হতে এসে খালি বাড়ীতে বসবাস করছিল।

বরফপাত হওয়াটা ধরে নিলাম আল্লার মরজি, কিন্তু ঘর বানানো তো আপনাদের ওপরই নির্ভর করে? পাথরের ঘর তৈরি করেন না কেন?

পাঠান আমার কথার উত্তর দিতে পারছিলেন না। বুঝলাম আসল কথাটা কি? যেহেতু হিন্দুরা পাথরের ঘর তৈরি করে বাস করে অতএব মুসলমানের

সেরূপ ঘরে বাস করতে নেই, এ ছিল কয়েকজন মোল্লার বিধান। সেই বিধান মানতে গিয়েই এই বিপদকে ডেকে আনা হয়েছিল। আমি যখন পাঠানের সংগে কথা বলছিলাম তখন মোটর ড্রাইভার বললেন "এদিকে আসুন বিশেষ দরকার আছে। হোটেলে গিয়াই শুনলাম, বয় নাকি বলেছে আজ যদি আমি এখানে থাকি তবে আমাকে হত্যা করবে। হোটেলের কেরাণী কথাটা নাকি ফাঁস করে দিয়েছে। বয় কেন আমাকে হত্যা করবে তার কারণ আমি জানতাম। গতরাত্রে সে আমার কাছ থেকে টাকা চেয়েছিল। টাকা পায় নি এটাই হল তার আক্রোশের কারণ। কেরাণী বিষয়টি গোপন রাখা ভাল মনে করে নি বলেই বলে দিয়েছিল। হোটেলে পৌঁছে দেখলাম বয় কাঁপছে। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম তুমি আজ এখান থেকে চলে যাও আমরা চলে গেলে ফিরে এস। বয় তৎক্ষণাৎ হোটেল ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

গজনীতে মুসলমানই বেশি তবুও হিন্দুর প্রতি এদের এত বিদ্বেষ কেন তা অবগত হওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। তারা বলেছিল যে, হিন্দুদের প্রকৃতি পয়মালের মত। পয়মাল মানে শূকর। শূকর জানে আক্রমণ করতে, মরতে এবং মারতে। এখানে হিন্দুরাও সেরূপ। তারা দরকার হলে আক্রমণ করে, মরে এবং মারে। অতএব এরূপ লোকের রীতিনীতি গ্রহণ করা নিশ্চয়ই অন্যায়।

বিকালে গজনীর পুলিশ অফিসারের সংগে সাক্ষাৎ করি। তিনি বেশ আদর-যত্ন করলেন। আমিই আফগানিস্থানের মোল্লাইজমের কথা উঠাই। তিনি বললেন "এখন আফগানিস্থানের মোল্লাইজম বিদেশীর দ্বারা পরিচালিত হয়। যত বৎসর আমানউল্লা রাজা ছিলেন তত বৎসর মোল্লারা মানুষের মতই কথা বলত এবং সমাজের রীতি-নীতি মেনে চলত, এখন তারা সমাজ পরিচালনা করছে। মোল্লারা অপরকে উস্‌কিয়ে দেয় মাত্র, নিজেদের কোন শক্তি নাই। শুধু তাই নয় এরা প্রথম শ্রেণীর ভীরু এবং কাপুরুষ। এদের দমন করতে এক

মিনিট সময়ও লাগে না। সব সময়ই এরা রাজশক্তির পেছনে থেকে রাজার আদেশ সাধারণ লোকের কাছে প্রচার করে।

সন্ধ্যা হতে চলেছে দেখে পুলিশ অফিসার আমাকে বিদায় দিয়ে বললেন এখন হোটেলে যান। কতক্ষণ পরই নেকড়ে বাঘ বের হবে, তখন হোটেলে যাওয়া সম্ভব হবে না। রাত্রে যদি কোনরূপ বিপদ-আপদ হয় তবে আমাকে ডাকলেই শুনতে পাব। আমার কাছে মেশিনগান আছে। নেকড়ে বাঘের উপর আমরা মেশিনগানও চালিয়ে থাকি।

সন্ধ্যার পরই পায়ের ব্যথা বাড়ে। সেদিনও বেশ ব্যথা আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু পায়ের ব্যথার চেয়ে নূতন ব্যথা দেখা দিল। দ্বিতীয় হোটেল-বয় আমাকে বিরক্ত করতেছিল। অবশেষে তাকে বলতে বাধ্য হলাম যে এদেশে কাম রিপু চরিতার্থ করবার জন্য আসা হয় নি, তোমরা এ বিষয়টা ধনী লোকের জন্য ব্যবস্থা করো। বেশি বিরক্ত করলে এখনই কুমিদাসকে ডাকব এবং তুমি জেলে যাবে। বয় তখন শান্ত হল। বয় বাবুর্চিদের ধারণা বিদেশীরা টাকার কুমির এবং বিদেশ ভ্রমণের একমাত্র কারণ হল কাম রিপু চরিতার্থ করা।

পরদিন অসুস্থ শরীর নিয়েই গাড়িতে বসলাম।

আজ আমরা যাব মুকুর নামক স্থানে। পথের অবস্থা খারাপ ছিল। যে দিকে তাকাচ্ছিলাম সর্বত্রই বরফে ঢাকা দেখতে পাচ্ছিলাম।

কিন্তু এক অভিনব চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়লাম। মুকুরের কাছে একটি বহুপুরাতন শিবমন্দির দেখতে পাব। মুকুরে পৌছবার পর আমার একটি সরাইএ উঠলাম। সকল কাজ স্থগিত রেখে একজন মাত্র লোক সংগে নিয়ে শিবমন্দির দেখতে গেলাম। অনেক বৌদ্ধমন্দির শিবমন্দিরে পরিণত হয়েছে জানতাম। কিন্তু এ মন্দির দেখে মনে হল এটা বৌদ্ধযুগেরও আগে তৈরী হয়েছিল। এতে বৌদ্ধযুগের স্থাপত্যবিদ্যার কোন নিদর্শন ছিল না।

মন্দিরটি পাহাড়ের গায়ে নির্মিত ছিল না। পাহাড় হতে একটু দূরে তবে

মন্দিরের চারিদিকে পাহাড়ের আবেষ্টন ছিল। দেখলেই মনে হয় এখানে মন স্থির করবার পক্ষে প্রশস্ত। একদিকে একটি প্রস্রবণ। যদিও প্রস্রবণের জল বরফ হয়েছিল তবুও চারিদিকের পর্বতমালা হতে উষ্ণ জল বরফের নীচ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। শিবলিংগটি আমাদের দেশের শিবলিংগের মত নয়। একটি লম্বা পাথর মাত্র, প্রকৃতপক্ষে মন্দিরটি পাহাড় কেটেই তৈরি করা হয়েছিল। তাতে অন্য পাথরের কোনরূপ সংযোগ ছিল না। এরূপ মন্দির পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আছে কি না বলা যায় না। তাজমহলের সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে সংযোগ বিয়োগের নিপুণতায়. কিন্তু এ মন্দির সে পদ্ধতিতে প্রস্তুত নয়। এই মন্দিরের বিশেষত্ব সংযোগ নয় বিয়োগে। অতি কষ্টে মন্দির দেখা শেষ করে গ্রামে ফিরে এলাম। রাত্রে যদিও পায়ের ব্যথা বেড়েছিল, তবুও মুসাফিরখানার পাঠানদের মাসাজে এবং ক্রমাগত গরম জল ব্যবহারে পায়ের অবস্থা বেশ ভালই ছিল।

মুকুর হতে রওয়ানা হয়ে খালাত নামক স্থানে পৌছলাম। এখানে দুদিন বিশ্রাম করি। আমরা যে ঘরটাতে ছিলাম সেখানে একজন পাঞ্জাবী হিন্দুও আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনিও আমার মতই পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন, সেজন্য আফগান ড্রাইভার আমাকে তাঁর পাশেই বিছানা করে দিয়েছিল। ভদ্রলোক বড়ই অমায়ীক। নিজের পায়ের ব্যথা ভুলে গিয়ে আমি যাতে আরাম পাই তারই ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে দু'জন রুশিয়ান্ ছিলেন। তাঁরাও বোধহয় তাঁরই সহকারী। এই দু'জন রুশদেশীয় ভদ্রলোকের সাহায্য পেয়ে শরীরটাকে সুস্থ রাখতে পেরেছিলাম।

পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বলছিলেন তিনি সোভিয়েট প্রজা হয়েছিলেন এবং বর্তমানে আফগানিস্থানে সরকারী কাজেই নিযুক্ত আছেন। আমাদের দেশের লোক সরকারী কাজের নাম শুনলেই মনে করে মস্তবড় একটি দাও অর্থাৎ সুযোগ এবং সুবিধা। রুশিয়ার সরকারী কাজ অথবা সাধারণ কাজ একই ধরণের।

প্রথমত ছুটি রুশ ভদ্রলোকের প্রতি আমার সন্দেহ হয়, এরা কি "সাদা রুশ ?" পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে জানলাম এরা white guard নন, ইহুদিদের আফগানিস্থান হতে ফিরে নেবার জন্য তাকে সাহায্য করছেন। ইহুদিরা হয়ত রুশিয়ায় যাবে না, তারা পেলেষ্টাইন যাওয়াই পছন্দ করে, কিন্তু সাদা রুশরা বুঝতে পেরেছে, ধর্মের নামে অথবা রাজার নামে পেট ভরবে না, বরং পেটের ক্ষুধা বাড়ে এবং অকালে মৃত্যু হয়।

অনেক সাদা রুশ আমাদের দেশে আসবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বৃটিশ সরকার তাদের ইণ্ডিয়াতে প্রবেশ করতে দেন নি। এদের কাজই ছিল কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লেক্‌চার দেওয়া। কিন্তু তারা জানত না যে বৃটিশ সরকার তাদের চেয়েও চতুর। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলতে হলেই প্রথমত বলতে হবে কমিউনিজম্ কি ? ভারতের লোক আপনা হতেই সে জিনিসটা জানবার সুযোগ পাবে। অনেকে হয়ত যার বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে সেই মতই গ্রহণ করবে। অতএব এই মতবাদ ভারতের লোক যত কম জানতে পারে ততই ভাল। এই ধারনার বশবর্তী হয়ে বৃটিশ সরকার পলাতক রুশদের ভারতে প্রবেশ করতে দেন নি।

এই সংবাদ কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশ হবে না ; সেজন্যই চাই স্বাধীন মতাবলম্বী পর্যটক—যে না খেয়ে, পথশ্রমে আধমরা হয়েও স্বদেশের এবং বিদেশের গোপন তথ্য সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরতে পারে। এতে সর্বসাধারণ জ্ঞাতসারে নিজেদের মতামত গঠন করতে পারে।

কোন এক ধর্মযাজক বলেছেন বেশি বই পড়া ভাল নয়। আমার ত মনে হয় না যে মানুষ বেশি বই পড়ে, বই পড়ার সময় কোথায় ? অন্নচিন্তায় যারা অস্থির তাদের হাতের কাছে বই ফেলে দিলেও তারা বই পড়বে না, সেজন্য সুধীজন বই লেখা বন্ধ করবেন না এটাই আমার ধারণা এবং পর্যটকগণ ধর্মযাজকদের কথায় নিশ্চয়ই কান দেবেন না।

পাঞ্জাবী এবং ছুজন রুশিয়ার যুবকের পরিশ্রম ফলবতী হতে চলছিল।

পলাতক রুশদের মতিগতি ফিরছিল। পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এবং অন্য দুজন রুশ-দেশীয় লোক—এই তিন জনে মিলে পলাতকদের খাদ্য, বস্ত্র এবং অর্থ বিতরণ করছিলেন। কাবুলে এদের দুরবস্থা দেখতে পেয়ে শিউরে উঠেছিলাম। স্বীয় মতবাদ বজায় রাখতে গিয়ে মানুষ যে কত দুর্দশা অম্লান বদনে বরণ করতে পারে, সাদা (পলাতক) রুশরা একের নম্বর দৃষ্টান্ত। কিন্তু এদের হঠাৎ মত বদলাবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলাম রীতিমত শিক্ষা পাবার পর এরা মত বদলিয়েছে।

ভারতীয় ভদ্রলোক বললেন, এ দুজন ভদ্রলোকই পলাতক রুশদের মত পরিবর্তন করিয়েছেন। এদের আমি মনপ্রাণে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি আরও বললেন আফগানিস্থানে যত পলাতক রুশ আছে তারা সত্বরই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবে। কান্দাহারে একজন পলাতক রুশের পোশাক পরিবর্তন দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন নবজীবন ফিরে পেয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম রুশ দেশে যাবার জন্য তার প্রবল ইচ্ছা হয়েছে কি? সে বলেছিল "মানুষ চায় কাজ এবং কাজের উপযুক্ত মজুরী। রুশদেশে তা পাওয়া যায়।" এখন ধর্ম সম্বন্ধে কি করবে জিজ্ঞাসা করায় লোকটি বলেছিল "এটা হল ব্যক্তিগত ব্যাপার।" আমি যদি মনে মনে প্রার্থনা করি কেউ জানবে না। একদা ধর্মের দরকার ছিল, বর্তমানে দরকার নেই। জ্ঞান অর্জন মনের উপযুক্ত অনুশীলন দ্বারাই হয়, বাইরের বেখাপ্পা আচার-ব্যবহারের ভেতর প্রকাশ পায় না।

দুদিন এদের সংগে কাটিয়ে তৃতীয় দিন রাত্রি দশটার সময় কান্দাহার পৌঁছলাম।

কান্দাহার

কান্দাহার একটি ছোট্ট সহর। কিন্তু এই সহরের গুরুত্ব এবং বিশেষত্ব কাবুল হতে কোন অংশে কম নয়। কান্দাহার বাস্তবিক পক্ষে ইণ্ডিয়ার প্রবেশ পথ। ইরাণ হতে যে সকল উপনিবেশকারী ভারতে প্রবেশ করেছিল তারা কান্দাহার হয়েই এসেছিল বেশি। হিরাত হতে একটি বড় রাস্তা কান্দাহার হয়ে বেলুচি-স্থানের চামন পর্যন্ত এসেছে। এই পথ দিয়েই অনেক বিশিষ্ট পরিব্রাজক এবং গজনীর সুলতান বার বার সোমনাথ আক্রমণ করেছিলেন। ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদ থাকবে না, ধর্মের প্রতিহিংসা থাকবে না, অতএব আমাদের পক্ষে কান্দাহার পুনরায় দখল করার দরকারও হবে না, নতুবা আমিও ফরাসী পর্যটকদের মতে বলতাম কান্দাহার ভারতের "লাইফ লাইন"। কান্দাহার ভারতের চাই। শুধু তাই বলতাম না, ফরাসী পর্যটকদের ডিঙ্গিয়ে আরও অগ্রসর হতাম এবং বলতাম দক্ষিণ পারস্থেরও কতকটা চাই, কারণ সেখানকার লোকও পোস্তভাষা বলে এবং তারাও জাতে ইন্দো-এরিয়ান। বুঝতে পেরেছিলাম এশিয়াতে ইউরোপীয়ানরা যে সাম্রাজ্যবাদ চালাচ্ছে সেই সাম্রাজ্যবাদ অতি সত্বর ধ্বংস হবে। চীনের সাম্রাজ্যবাদী মতলব ছিল শুধু চীনা ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমাদের স্বাধীনতা পাবার ইচ্ছা সকলের মনে আলোকায়িত, ইন্দোচীনের অবস্থাও তাই—অতএব এশিয়া আর পরাধীন থাকবে না। এখন বুঝতে পেরেছি বহুপূর্বে আমি যে ধারণা করেছিলাম তাই ফলবতী হয়েছে। আমরা স্বাধীন হয়েছি এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর কি হতে পারে?

এখন এসব সাম্রাজ্যবাদী তথ্যের কথা পরিত্যাগ করে কাজের কথা বলা চাই। কান্দাহারে পৌঁছেছিলাম গভীর রাত্রে। আফগান্ মোটর ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করেছিল কোনও সরাই অথবা হোটেলে আমাকে রেখে যাবে কি? তাকে বলেছিলাম "এসব হতে পারে না, আমার পায়ের অবস্থা ভাল নয়, অতএব

কোনও হিন্দুর বাড়ীতে রেখে যাও।” আমার আদেশ অনুযায়ী সে একটি হিন্দু-পরিবারে আমাকে রেখে যাবার জন্য গভীর রাত্রে একটি দরজার কড়া নাড়ল। বাড়ীর মালিক দরজা খুলে একজন অপরিচিত লোকের মুখ দেখা মাত্র মুখ ফিরিয়ে নিলেন কিন্তু মোটর ড্রাইভার ছাড়বার পাত্র নয়। সে বললে, “আমি ত এঁকে তোমার দরজায় রেখে যাচ্ছি তারপর তুমি যা হয় করো।” যেমন কথা তেমন কাজ। আমাকে রেখে মোটর ড্রাইভার তখনই চলে গেল। বর্জনশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন হিন্দু মহাশয় আমাকে ঘরে স্থান দিতে বাধ্য হলেন এবং তার পরের দিন সকালে উঠেই নিকটস্থ শিব-মন্দিরে আমার থাকবার এবং খাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে কৃতার্থ করলেন। শিব-মন্দিরে আসার পর পায়ের রোগ সেরেছিল, শরীরের গ্লানি অপসরণ হয়েছিল, জানবার মত সুযোগ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বাবা ভোলানাথ নামক মন্দির-রক্ষকের সাহায্য পেয়ে আফগানিস্থান সম্বন্ধে যা কিছু জানবার ছিল, সবই জেনে নিয়েছিলাম।

কান্দাহারের অন্য কিছু বলবার পূর্বে সহরটির প্রাকৃতিক অবস্থা বিশেষ করে বলা চাই। আমরা যখন দারজিলিং যাই তখন সেখানে যেয়েও পাহাড়িয়া পথে চলাফেরা করি। কান্দাহার সেরূপ নয়। বেশ সুন্দর সমতল ভূমি। সহরের মধ্যে প্রবেশ করলে মনে হয় না আশেপাশে পাহাড় রয়েছে। অথচ চামনের দিক থেকে যদি কান্দাহার যাওয়া যায় তবে বুঝতে পারা যাবে কত পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তারপর কান্দাহার পৌছান যায়। কত বিপদসংকুল পথ পেরিয়ে তারপর কান্দাহার পৌছবার সৌভাগ্য হয়। অবশ্য যে পথটার কথা আমি বললাম তার সবটা আমি দেখি নি কিন্তু পিসিন পর্যন্ত দেখেছি এবং তাতেই ধারণা হয়েছে তথা কথিত বেলুচিস্থানের পার্বত্য অঞ্চল কত বন্ধুর। এখানে তথাকথিত শব্দটি ব্যবহারের কারণ হল, বেলুচিদের পাঠান হতে বিচ্ছিন্ন করতে চাই না। যাদের ভাষা, সংস্কৃতি একই তাদের বিচ্ছিন্ন করবে এবং শাসন ও শোষণ করবে পুঁজিবাদীর দাস সাম্রাজ্যবাদী। আমি কেন এই পাপে পা

বাড়াব? আমার কোন দাবী নাই সে দেশে। হাঁ, দাবী থাকত এবং থাকবে যদি ইণ্ডিয়া সাম্রাজ্যবাদী হয়। ইণ্ডিয়া সাম্রাজ্যবাদী হবার পূর্বে যদি অন্য কোন-বাদ গ্রহণ করে অথবা আমি পৃথিবী হতে বিদায় নেই তবে কে এই পাপঅর্জিত অপর দেশের অপহরণ করা সুখ-সম্পদ ভোগ করবে? কতকগুলি দস্যু এবং জুয়াচ্চোর। আমি তাদের মধ্যে থাকব না। অতএব এখানে তথাকথিত শব্দটি ব্যবহার করলে কোন দোষ নাই।

পূর্বে বলেছি বাবা ভোলানাথের সাহায্য পেয়ে আফগানিস্থানের সব কিছু জানতে পেরেছিলাম। বাবা ভোলানাথ একজন যুবক। যদিও তাঁর বৈদেশিক ডিগ্রী ছিল না অথবা থাকবার কথাও নাই তবুও তিনি একজন শিক্ষিত লোক। যদিও তিনি তখনও বিয়ে করেন নি তবুও তিনি যে বিয়ে করবেন না তার কোনও প্রমাণ ছিল না। সাধারণ গৃহস্থ যেমন করে জীবন কাটায় তিনিও তেমনি জীবন কাটাচ্ছিলেন। অতএব কেউ যেন ভুল করে বাবা ভোলানাথকে, ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা বা সন্ন্যাসী না মনে করেন। যেখানে হিন্দুর খাদ্যের এবং অর্থের প্রাচুর্য রয়েছে সেখানে এসব সং সেজে লাভ কি?

বাবা ভোলানাথের এবং তাঁর সহকর্মীদের সাহায্যে কয়েক দিনের মধ্যেই আমার পা ভাল হয়েছিল। চলাফেরা করার সুযোগ পেয়ে ভেবেছিলাম এবার পৃথিবী ভ্রমণের পথ পরিষ্কার হল, কিন্তু সেই সংগে এটাও ঠিক করলাম, যতদিন আকাশ পরিষ্কার না হবে, যতদিন শীতের প্রবলতা অপসরণ না হবে, ততদিন এই মন্দিরেই থাকব। পথ সুগম হলে বের হওয়া যাবে। খামখেয়ালী প্রকৃতি যেমন শুনবে না, পথও তেমনি সুযোগ সুবিধা দেবে না। বাবা ভোলানাথকে পরিষ্কার করে বিষয়টা বুঝিয়ে দেবার পর তিনি বলছিলেন মন্দিরের মধ্যেই তিনি এমনি রকমের আবহাওয়ার সৃষ্টি করবেন যাতে আমার কোনও কষ্ট হবার কারণ থাকবে না। চলাফেরা করার সুযোগ পেয়েই যিনি আমাকে প্রথমদিন স্থান দিয়েছিলেন তাঁর বাড়ীতে যাই। তিনি দুঃখ করে

বলছিলেন যে দিন তার বাড়িতে আমি প্রবেশ করি সে রাত্রেই তার ভাই নিমোনিয়া রোগে মারা যান এবং সেজন্যই আমাকে তিনি স্থানান্তরিত করে ছিলেন। আমাদের দেশের মত আফগানিস্থানেও কুসংস্কার আরও একটু বেশি করে রয়েছে। তাদের ধারণা হয়েছিল আমিই মৃত্যুকে সংগে করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। মৃত্যু ভদ্রলোকের ভাইকে নিয়ে গেছে; আর কাকেও না নিলেই রক্ষা।

প্রথমদিন সহর বেড়িয়ে বুঝতে পারলাম এখানে অনেক জাতের লোক বাস করে। জাতবিচার নৃতত্ত্ব মতে করেছিলাম। বাস্তবিক পক্ষে যাকে হরেক রকমের জাত বলেছি সেটি সকলের চোখে ধরা পড়বে না। এ সংবাদটি নৃতত্ত্ববিদদের জন্য। অবশ্য ধর্মের দিক দিয়ে তিনটি ধর্মের লোক দেখলাম। হিন্দু, মুসলমান এবং ইহুদী। এখানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত ছিল, বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্মের নাম-গন্ধ নাই, শুধু রয়েছে কয়েকটি পাথরের মূর্তি। সেই মূর্তি-গুলিকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু এখনও সেই পাথরের মূর্তি পুরাতন যুগের মানুষের হস্ত শক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য পাথরগুলির বিকলত্ব হয়েছে। আজ যদি কেউ এই পুরাতন পাথরের মূর্তিগুলিতে মানুষের চোখের অন্তরাল করতে চায়, তবে হাজার লোক মিলে যে কাজটি দশ দিনেই শেষ করতে সমর্থ হবে।

সহরদেখা শেষ করে গ্রামের দিকে চলে গিয়েছিলাম। গ্রামের দিকে যেয়েই পাথরের পাশেই চুনাপাথর দেখে মনে হল, যদি ভূমিকম্প হয়, তবে এই সহর হ্রদে পরিণত হতে কতক্ষণ। কিন্তু সে দৃশ্য চিন্তা করতেও ইচ্ছা হল না। গ্রাম ছেড়ে সহরে ফিরে এলাম।

সেই বৎসরই কোয়েটাতে ভূমিকম্প হয়ে অনেক ধন এবং মানুষ নষ্ট হয়েছিল। আমি মনে করেছিলাম কান্দাহার সহর লোপ হয়ে একটি হ্রদে পরিণত হবে, তা হয় নি এমন কি কম্পনও হয় নি। কিন্তু নিশ্চয় করে বলতে পারি যদি হিমালয়

পর্বতের কোনও অংশ সাগরে পরিণত হয় তবে বেলুচিস্থানের কোয়েটা অঞ্চলের সংগে কান্দাহারও ডুবে যাবে।

সেদিনই সহরের গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। গভর্ণরের নামে আমার কাছে প্রধান মন্ত্রীর এক খানা পত্রও ছিল। পত্র দেবার পর তিনি আমাকে আদর যত্ন করেছিলেন এবং তাঁর দেওয়া মস্ত বড় একটি বাড়ীতে থাকতে বলেছিলেন। সেখানে খাওয়া থাকা ত পেতামই, উপরন্তু ভোগ বিলাসের ত্রুটি হত না। ভোগ-বিলাস মানুষ চায়, আমিও চাই কিন্তু সকল সময় ভোগ-বিলাসের দিকে তাকালে যা চাওয়া যায় সেটা পাওয়া যায় না সেজন্যই গভর্ণরের বাড়ীতে থাকি নি। বাবা ভোলানাথের বাড়ীতেই থাকতে পছন্দ করেছিলাম। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, কোনও মুসলমানের বাড়িতে থাকিনি কেন, তারও উত্তর দিয়ে দিচ্ছি। এই সহরে কোনও প্রগতিশীলের সংগে দেখা হয় নি বলেই অন্যত্র যেতে পারি নি।

গভর্ণরের সেক্রেটারী খরকা সরিফ এবং বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখে যেতে বলছিলেন। বুদ্ধদেবের মূর্তি পরে দেখেছিলাম এবং খরকা সরিফ ফেরবার পথেই দেখেছিলাম। খরকা সরিফ বলতে একটি মস্‌জিদকে বুঝায়। এই মস্‌জিদের বিশেষত্ব আছে। আমান উল্লার সময়ে খরকা সরিফের বিশেষত্ব ছিল না, নাদীর খানের রাজত্বের আরম্ভেই খরকা সরিফের বিশেষত্ব ফিরে আসে।

যদি কোন লোক কোনও লোককে হত্যা করে এবং সে জানে লোকহত্যা অন্যায়ভাবে করেছে তবে সে খরকা সরিফে আশ্রয় নেয়। খরকা সরিফের আশ্রিত নরহত্যাকারীকে পুলিশ কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। এখানে ধর্মের বিচার নাই। যে কোন ধর্মের লোক খরকা সরিফ নামীয় মস্‌জিদে আশ্রয় নিতে পারে, মুসলমান মোল্লা সেই আশ্রিত লোককে তাড়িয়ে দেবার অধিকার রাখে না। এই হল খরকা সরিফের বিশেষত্ব। এমন বিশেষ স্থানটি না দেখলে আমার পক্ষে আফগানিস্থান ভ্রমণই পণ্ড হয়ে যেত।

আফগানিস্থানে সমাজের শাসন কড়া বলে সেখানকার ভিক্ষাজিবীদের বড়ই দুর্দশা। ভিক্ষাতে ভিক্ষুকের পেট ভরে না। বস্ত্রের যোগাড় হয় না। মাথা গুঁজবার উপযুক্ত আশ্রয়ও তাদের মেলে না। এরূপ অবস্থায় শীতপ্রধান দেশের গরিব লোকদের ভয়ানক কষ্ট পেতে হয়। এ কথাটা আমান উল্লা ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন, সেজন্যই দেশের দারিদ্র্য যাতে দূর হয় তার চেষ্টা তিনি বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। আমার মনে হয় বাচ্চা-ই-সাক্কো দারিদ্রকে আরও বেশি টের পেয়েছিলেন। সেজন্যই তিনি আমান উল্লার চেয়েও দ্বিগুণ উৎসাহে এবং দ্রুত দেশের দারিদ্র্য মোচন করতে গিয়ে বিদেশীর বিরাগভাজন হন। লোকে বলে একদিন জনৈক হিন্দু পুঁজিপতি নাকি বাচ্চা-ই-সাক্কোকে ভয় দেখিয়ে বলছিলেন রাজ্য-দখল করতে পার কিন্তু রাজ্য চালাতে হলে আমার কাছে তোমাকে আসতেই হবে। বাচ্চা-ই-সাক্কো তার দ্বারস্থ যাতে না হতে হয় সেজন্য নোট তৈরী করেন এবং সেই নোট নিতে সর্বসাধারণকে বাধ্য করেন। আফগানিস্থানে তখনও নোটের চলন হয় নি, বর্তমানে অবশ্য হয়েছে।

কয়েকদিন পরে পুরাতন বৌদ্ধ-যুগের স্থাপত্যশিল্প দেখার জন্য বেরিয়েছিলাম। পথে দেখা হয়েছিল কয়েকজন পাঞ্জাবী মোটর ড্রাইভারের সংগে। ওদের কথায় বুঝলাম, এরা আর দেশে ফিরে যাবে না, সুযোগ পেলেই রুশ দেশে যাবে। দেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা বললে, পাঞ্জাব যদিও বেশ সুন্দর দেশ, খাদ্যের অভাব নেই, তবুও অভাব-গ্রস্তদের পক্ষে কোন মতেই সেখানে বাস করা উচিত নয়। কটা মাত্র সরকারী চাকুরি আছে, তাই নিয়ে সেখানে কামড়া কামড়ি চলছে। কাজ আছে, মজুরি নেই। সিনেমা আছে, দেখবার পয়সা নেই। শরীরে শক্তি আছে, মাথায় বুদ্ধি আছে কিন্তু সদ্ব্যবহারের পন্থা নেই। ড্রাইভারগুলি সবাই মুসলমান। তাদের বললাম "দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া ভাল নয়, দেশকে অন্যান্য দেশের মত গড়ে তোলা তাদের কর্তব্য এবং এসম্বন্ধে স্থিরচিত্তে চিন্তা করা উচিত। রুশ দেশকে বর্তমান অবস্থায় উপনীত

হতে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। আপনারা চাইবেন সাজানো বাগানে বসতে, সেরূপ সাজানো বাগান নিজদেশে তৈরি করলেই সকল দুঃখের অবসান হবে।"

একজন রাগ করে বললেন "আরে বাবু তুম সমজতা নেহি, মুলুকমে মজবকা বদখেয়াল হটানা বহুত মুস্কিল।"

ওদের কথা শুনে হাসছিলাম আর ভাবছিলাম, ভারতের সমাজে ধর্মের কি অপ্রতিহত প্রতাপ। দেশবাসীকে তা বিদেশে পর্যন্ত পালাতে বাধ্য করছে। কিন্তু এই দুষ্ট প্রভাব থাকবে না, থাকতে পারে না।

সহরের বাইরে পাহাড়ের ওপর প্রকাণ্ড একটি বুদ্ধ-মূর্তিটির মুখের দিকটা ভেঙে ফেলেছে। লোকে বলে শঙ্করাচার্যের মতবাদ প্রচার হবার পর এই মূর্তির অনেকটা ভাঙা হয়েছিল। মুসলমান ধর্মের অভ্যুদয়ের পর আরও ভাঙা হয়েছে। আজ যাকে বহু যত্নে গড়া হয়েছিল কাল তাকে নির্মমহস্তে বিধ্বস্ত করা হল। এটা হবেই। কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না। ধর্মগত বিদ্রোহের সংগে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিদ্রোহের যোগ আছে। অর্থনীতি যাতে ভাল ব্যবস্থার ওপর গড়ে ওঠে তারই চেষ্টার সংগে আমরা দেখতে পাই ধর্মের বিরুদ্ধেও
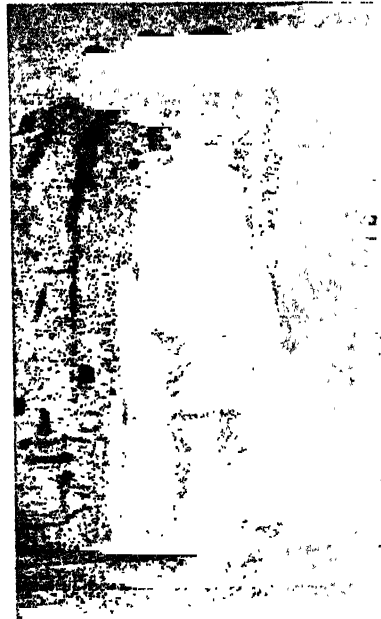
কান্দাহারে বুদ্ধের একটি মূর্তি

বিদ্রোহের সূচনা। বাস্তবিক, ধর্ম হল মানুষের গড়া, তার পরিবর্তন হয়েছে, হবেও; সম্বন্ধ রয়েছে পরিবর্তনশীল সমাজের সংগে।

যখন আমি মূর্তিটি পর্যবেক্ষণ করছিলাম তখন কয়েক জন লোক আমাকে দূর থেকে লক্ষ্য করছিল। আমার দেখা শেষ হয়ে গেলে পাহাড় থেকে নেমে আসার পর দর্শকগণ জিজ্ঞাসা করলেন "এই মূর্তিতে কি কিছু আছে?" এটা কি একটা ভূত? এটাকে এখনও আফগান সরকার রক্ষা করছেন কেন? এটা তো হিন্দুরও দেবতা নয়?" আমি তাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শুধু বলেছিলাম "লেখাপড়া শিখুন তারপর সবই জানতে পারবেন। সে দিনের কর্মতালিকা সেখানেই শেষ করি।"

বুদ্ধদেবের মূর্তির পাশ দিয়েই একটা বড় রাস্তা চলে গেছে। সেই পথ ধরে চলার সময় একটি বিদ্যালয় দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে শুনলাম এখানে যে-কটি বিদ্যালয় আছে তাতে উচ্চশিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। শুধু প্রাথমিক-শিক্ষাই দেওয়া হয়। কয়েকটি বিদ্যালয় বেড়িয়ে এসে বুঝলাম শিক্ষার মান এখানে বড়ই নীচু। হিন্দুদের ছেলেরা স্কুলে যায় না, তারা ঘরে বসেই লেখাপড়া করে। এটা কেন করে তা জানতে গিয়ে বুঝেছিলাম আভিজাত্য এর কারণ নয়, ইসলাম-ধর্মের প্রতি বিতশ্রদ্ধাই তার একমাত্র কারণ। সাধারণ মজুরের ছেলের সংগে বসে লেখাপড়া শিক্ষা করাটাও ভাল নয় বলেই এখানকার হিন্দুরা মনে করে। সেটাও সাধারণ হিন্দু ছেলেদের স্কুলে না যাবার কারণ হতে পারে। আমি একদিন জনৈক হিন্দুকে বলছিলাম "ঘরে বসিয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আপনাদের ছেলেরা লোকের সংগে মেলামেশার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে, সেখানেও তারা স্বাস্থ্য-চর্চার সুযোগ লাভ করতে পারত। হিন্দু ভদ্রলোক আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া অনাবশ্যক মনে করেন।

আফগানিস্থানেও মধ্য-ইউরোপীয় প্রথামত ছাত্রদের পৃথক পোশাক পরতে হয়। প্রত্যেক ছেলের মাথায় ফেজ অথবা পাগড়ীর বদলে মধ্য-ইউরোপীয়

প্রথায় টুপি পরতে হয়। নিয়মটি বড়ই সুন্দর। এখানে কিন্তু কোন ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে হয় না। প্রত্যেক ছেলেকে বুট-পট্টি লাগিয়ে স্কুলে যেতে হয়। আফগানিস্থানের শিক্ষাবিভাগে জার্মান, তুর্কি এবং আংশিক ভাবে ফ্রেঞ্চ প্রথা প্রচলিত হওয়ায় স্কুলে সাম্প্রদায়িক ভাব মোটেই জাগতে পারে না। উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু ছেলেরাও যায়।

কান্দাহারে যখন নানা বিষয়ের তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলাম একদিন সকাল বেলা একটি হিন্দু পথে চীৎকার করে বলে যাচ্ছিল, "এক বাংগালী বন্দী মর গিয়া, শ্মশানমে চলিয়ে।" কথাটা শুনেই ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করলাম "এখানে বাংগালী বন্দী এল কোথা হতে?"

ভোলানাথ বললেন, যে লোকটি মরেছে সে বাংগালী বলে কোন প্রমাণ নেই, তবে সবাই অনুমান করে লোকটি বাংগালীই হবে নতুবা এরূপভাবে মরত না। ভোলানাথ বলছিলেন "দুটি সন্ন্যাসী সীমান্ত পার হয়ে আফগানিস্থানে প্রবেশ করে। প্রচলিত আইন মতে এসব আইন-ভংগকারীদের কয়েকদিন জেলে রেখে আবার চামন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এসব লোকের আহারাদির বন্দোবস্ত আমরাই করে থাকি এবং যখনই এরূপ লোকের আগমন সংবাদ আমাদের দেওয়া না হয় তখনই আমরা মনে করি নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনও রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। এরূপ অনেক ঘটনা ঘটেছে। তারপর কি হয়ে গেল বলতে পারি না, একদিন সব কয়েদী মিলে এদের দুজনকে খুব এক চোট প্রহার করল। তারই ফলে একজন অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই লোকটি মনের দুঃখেই বোধ হয় কোন ঔষধ না খেয়ে শীতের রাত্রে বরফের ওপর শুয়ে থেকে শেষটায় নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। যখন লোকটি শীতে বরফের উপর বসে থাকত তখন কয়েকজন প্রহারকারী কয়েদী তাদের অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তার কাছে ক্ষমা চায়। তারাই আমাদের সে সংবাদ দেয়। আমরা তাদের জন্য খাবার পাঠাতে থাকি কিন্তু যাকে বাংগালী বলে সন্দেহ করা হয়েছিল

সে আর কিছু খায় নি। এরই মাঝে এই লোকটিকে আবার প্রহার করবার জন্য যখন কয়েকটা কয়েদী পরামর্শ করছিল, তখন অন্যান্য কয়েদীরা তাতে বাধা দেয় এবং তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে। সবাই বুঝতে পেরেছিল, জেলের বার থেকে অন্য কেহ বাংগালী কয়েদীর জীবননাশের চেষ্টা করছিল।

একদিন স্থানীয় হিন্দুরা যখন আধমরা লোকটির কাছে খাবার নিয়ে রেখেছিল, তখন কোথা হতে একটা কয়েদী এসে খাদ্য কেড়ে নিয়ে যায়। অন্যান্য কয়েদী সেই সংবাদ অবগত হয়ে তাকে শাস্তি দেবার জন্যই অর্ধমৃত লোকটির শুশ্রূষায় তাকে নিযুক্ত করে। তাতে ফল খারাপই হয়েছিল। অর্ধমৃত লোকটি দণ্ডিত কয়েদীকে কাছে দেখলেই অবোধ্য ভাষায় কি গালি দিত এবং হিন্দিতে বলত "তুই আমার সামনা হতে চলে যা, তুই পশু, টাকার গোলাম, তোর মুখ দেখতে ঘৃণা হয় ইত্যাদি।" অন্যান্য কয়েদীরা শেষটায় ঐ কয়েদীকে আর তার কাছে যেতে দিত না। বিনা চিকিৎসায় অনশনে থেকেই লোকটির মৃত্যু হয়েছিল।

সেদিনই আমি বৃটিশ কনসালের নিকট বাংগালী বলে কথিত কয়েদীর মৃত্যুর কথা উত্থাপন করি। কনসাল ছিলেন একজন ভারতীয়। তিনি মৃত লোকটিকে বাংগালী বলে অস্বীকার করেন। তাঁর কথার ওপর আমার কোন তর্কই খাটে না। সেজন্য এ বিষয়ে আর ব্যর্থ চেষ্টা না করে গভর্ণরকে বলে কয়ে অন্য কয়েদীটিকে জেল হতে খালাস করে চামন পাঠিয়ে দিলাম। এই কয়েদীটি সত্যই বাংগালী ছিল কি না কে জানে, তবে কান্দাহারের লোকের ধারণা মৃত লোকটি বাংগালী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। সেই সময়ে অনেক বাংগালী যুবক স্বদেশ হতে বিদেশে যেয়ে শিক্ষার পথ প্রশস্ত করতেন। সেই শিক্ষা বি, এ, এম, এ, পাশ নয়। রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন। বৃটিশ সেই জিনিসটা বুঝতে পেরেছিল এবং তার ফলে কৌশলে বাঙ্গালী এবং পাঞ্জাবী বিপ্লবীদের প্রতি যখনই সন্দেহ হ'ত তখনই হত্যার ব্যবস্থা করত।

এখানে হিন্দুদের মৃতদেহ সংকারের বেশ সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। স্থানটা সহরের কাছেই। দারওয়ান মুসলমান। সংকার-স্থানের চারদিকে ফল ও ফুলের বাগান এবং বসবার সুবন্দোবস্ত ও রয়েছে। স্নানের জন্য গরম জলের বড় টব মজুত ছিল। কাঠও অনেক জমা করে রাখা ছিল। সহরের এত কাছেই হিন্দুদের সংকারের স্থান থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় মুসলমানরা কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করে না। দারওয়ান শ্মশানভূমির চারদিকের ফলের-বাগান বিক্রি করে বৎসরে প্রচুর টাকা পেয়ে থাকে। আমাকে দেখা মাত্র সে ভেবেছিল আমি হয়তো একজন সেপাই হব, তাই প্রবেশ করতে দিতে আপত্তি করছিল। কিন্তু অন্য লোক এসে আমার পরিচয় দেওয়ায় প্রবেশপথ উন্মুক্ত হল।

কান্দাহার এক আজব সহর। এখানে নানারূপ গুজব দেশ-বিদেশ হতে আমদানি হয়ে নতুন আকৃতি ধারণ করে। আমি আড্ডায় বসে তাই শুনতাম। একদিন একজন হিন্দু ভদ্রলোক বললেন, গুজব বিশ্বাস করে ১৯১৭ সালে তিনি প্রায় দুই লক্ষ রুশদেশীয় কাগজের রুবুল কিনেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন একদিন কাগজের রুবুল বদলি করে সোনা যোগাড় করবেন, কিন্তু দুঃখের সহিত জানালেন এসব কাগজ বর্তমানে দেরাজেই আছে, এক পয়সা দিয়েও তা কেউ কিনবে না। মনের দুঃখে তিনি আমাকে একখানা একশত রুবুলের নোট দিয়েছিলেন।

আড্ডায় বসে নানারূপ গল্প শুনতাম আর পেয়ালার পর পেয়ালা চা খেতাম। একদিন আড্ডাতে একটা মজার ঘটনা ঘটল। পূর্বেই বলেছি বাবা ভোলানাথ বর্তমান যুগের লোক। তিনি অতীতকে ভুলতে চান আর বর্তমানকে বরণ করতে চান। একজন ভদ্রলোক এসে বাবা ভোলানাথের পা ছুঁয়ে কি বললেন তার কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না। ওদের কথা যখন শেষ হয়ে গেল তখন ভোলানাথ বললেন, কি করব ভাই মাথার মাঝে আক্কেল নেই বললেও চলে। ঐ লোকটিও হিন্দু। সে গোপনে একটি বিধবার প্রতি আসক্ত ছিল।

স্ত্রীলোকটির সন্তান হবার সম্ভাবনা হয়েছে অথচ এদিকে বিয়ে হবার নামটি নেই। এখন এদের একটিমাত্র পথ খোলা রয়েছে, যদি সন্তানটি রক্ষা করতে হয় তবে প্রকাশ্যে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান প্রথামতে বিয়ে করা, এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। এখানে আর্যসমাজীও নেই যে এর বন্দোবস্ত করতে পারে।

যারা আড্ডাতে বসেছিলেন তাদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করলাম। বলুন ত এ সম্বন্ধে এখানকার আইন কি বলে?

এখানকার প্রথা এই যে, যদি কেউ গোপনে অন্য স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করে তবে আইনমতে সে স্ত্রীলোকটিকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়।

আইন জেনে নিয়ে বললাম "স্ত্রীলোকটি বিচারপ্রার্থী হোক এবং কাজি যখন পুরুষটিকে বিয়ে করতে বলবেন তখন সে যেন তৎক্ষণাৎ রাজি হয়। তখন কথা হবে কোন্ ধর্মমতে বিয়ে হবে?" আমি বললাম "সে যেন তখন মুস্লিম ধর্ম মতে বিয়ে করতে রাজি না হয়, তা হলে কাজি হিন্দুমতে বিয়ের ব্যবস্থা করিয়ে দিতে বাধ্য হবেন।"

আমার প্রস্তাব মত স্ত্রীলোকটি বিচারপ্রার্থী হয়েছিল। কাজি হিন্দুদের হিন্দুমতে বিয়ে করিয়ে দিতে আদেশ করেন। হিন্দুটি রাজি হয়েছিল, বিয়ে হয়ে গেছে বলে স্বীকারও করেছিল, কিন্তু কাজে কিছুই করেনি বলে শুনেছিলাম।

অতি কম লোকই ঐসব ব্যাপারে বিচারপ্রার্থী হয়। অনেকেই ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করে বিবাহকার্য সম্পন্ন করে। এরূপ করেই কান্দাহারে হিন্দুদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আমার মনে হয় পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই কান্দাহার হতে হিন্দু লোপ পাবে। কারণ এখানে কোনরূপ সামাজিক পরিবর্তন হিন্দুদের মধ্যে মোটেই আসছে না।

কান্দাহারে একমাস থাকার পর শরীর সুস্থ হয়ে উঠল, কিন্তু হিরাতের পথ তখনও জলে ভর্তি ছিল। সেজন্য আরও এক সপ্তাহ কান্দাহারের পথে-ঘাটেই বেড়িয়ে কাটাতে হল। এই একটি সপ্তাহ হিন্দুদের সংস্রব পরিত্যাগ করে

মুসলমানদের পাড়ায় এবং নিকটস্থ গরিব লোকদের গ্রামেই কাটিয়েছিলাম। গ্রামের লোক ইউরোপীয় পোশাক অনেকেই পছন্দ করত না এবং আমার কাছে অনেকেই বলত এ পোশাক এদেশে ভাল মানায় না। আমি ওদের ধর্মযাজকদের সামনেই বলতাম, ইউরোপীয়ান পোশাকই এদেশের পক্ষে উপযুক্ত এবং যুক্তি দিয়ে তা বুঝিয়েও দিতাম। কর্তৃপক্ষ একদিনও আমার এরূপ উক্তির কোনরূপ প্রতিবাদ করেন নি, কিন্তু একটি ভারতীয় চাপরাশি একদিন আমার কথার প্রতিবাদ করেছিল।

বনভোজন করার জন্য সেদিন আমরা এক গ্রামে গিয়েছিলাম। সংগে করে একটা জ্যান্ত মোরগও নিয়েছিলাম। মোরগটা হত্যা না করে সংগে নিয়ে যাবার একমাত্র কারণ গ্রামে মোরগটার গলা না কেটে এক কোপে কাটলে গ্রামবাসী রাগ করে কি না দেখতে চেয়েছিলাম। আমার সংগীরা এক কোপে কখনও মোরগ কাটে নি ; সেজন্য আমাকেই সে-কাজটি সম্পন্ন করতে হয়েছিল। দুএকজন গ্রামের লোক মোরগ-হত্যা দেখেও ছিল, কিন্তু তারা কেউ কিছু বলেনি। কান্দাহারের হিন্দুরা বলে, মুসলমানরা তাদের অমতে কোন জীবকে হত্যা করতে দেয় না সেজন্য তারা জীবহত্যা করা বন্ধ করে দিয়েছে। পরে বুঝেছিলাম হিন্দুরা মাংস খেতে খুব ভাল করেই জানে কিন্তু ঠেকায় পড়লেও তারা মোরগ-হত্যা করতে সক্ষম হয় না। এরূপ যাদের দুর্বল মন তারাই নিপাত যাবার উপযুক্ত। এরূপ আয়েসী লোকের বেঁচে থাকা মানে ভু-ভার বৃদ্ধি করা।

যে গ্রামে বনভোজন করতে গিয়েছিলাম সেই গ্রামের লোক দেখতে বড়ই নিরীহ কিন্তু তাদের মন ভীরু নয়, সজাগ এবং সাহসী। আবাদি-ভূমি কোন মতেই কারো কাছে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। আবাদি-ভূমি নিজের হাতে রাখবার জন্য সর্বদাই শস্যবীজের মত ঘরে অস্ত্রও মজুত রাখে। দরকার হলে গ্রামকে গ্রাম ছাউনীতে পরিণত করতে পারে। গ্রামের লোক সুখী তবে তাদের প্রাচুর্য নেই। গ্রামে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। তারা সহরের মোল্লাদের মত রাক্ষা

টপকাবার ফুরসত পায় না। মালা টপকানোটা আফগানিস্থানে একটি ফেশন্ এবং এখনও সেটা আছে। যে কেউ একটু আরামের মুখ দেখে সেই অমনি মালা কিনে টপকাতে শুরু করে দেয়। রাজকর্মচারী হতে সাধারণ ধনী পর্যন্ত সবাইকে এই কর্মে লিপ্ত দেখা যায়। যে কয়েক দিন গ্রামে ছিলাম সেই দিনগুলি আনন্দেই কেটেছিল।

গ্রাম হতে ফিরে এসে আড্ডায় বসে কান্দাহার ছেড়ে হিরাতের দিকে যাবার কথাই ভাবছিলাম এমন সময় ইয়াকুব এসে হাজির। তাকে দেখেই আমার ইচ্ছা হল তাকে কাছে এনে বসাই কিন্তু আমাকে সে যে পরিচয় দিল তাতে তার ওপর মন বিরূপ হয়ে উঠল। সে সহকারী মোটর ড্রাইভারের কাজ নিয়েছিল। এখন সে সাধারণ মজুর কিম্বা কৃষকও নয়। সহকারী মোটর ড্রাইভারের কাজ যারা করে, তাদের অনেক সময়ই লোকে অসৎ চরিত্র বলে গণ্য করে। সুতরাং এ ধারণা মনে বদ্ধমূল হওয়া অসংগত নয়, এবার ইয়াকুবের চরিত্র কলুষিত করতে বসেছে। সে আমাকে বললে "শুনেছি, আপনি নাকি হিরাত যাবার মোটর খুঁজেন, আমাদের একখানা মোটর আছে। যদি আপনি আমাদের মোটরে হিরাত যান তবে সুখী হব। তৎক্ষণাৎ তার সংগে মোটরের ভাড়া ঠিক করে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে তার মোটর কোথায় আছে দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আড্ডা হতে বের হয়ে এসেই ইয়াকুবকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কেমন আছে, এতদিন কোথায় ছিল—ইত্যাদি ?

সে আমাকে জানালে লেখাপড়া যা শিখেছে তাই যথেষ্ট। এখন সমুদয় আফগানিস্থান বেড়িয়ে তারপর সীমান্ত দেশগুলি দেখে রাজনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। সেজন্যই সে এই রকমের কাজ জুটিয়েছে। ছাত্র হয়ে ঘুরে বেড়ানো সন্দেহ উৎপাদন করে।

মোটরের আড্ডা বেশি দূরে ছিল না। আমরা সেখানে কয়েকজন আফগান ড্রাইভারকে জুয়া খেলায় ব্যস্ত দেখলাম। তারা অনেকেই আমাকে একজন

সহকারী কর্মচারী বলে মনে করেছিল কিন্তু ইয়াকুব আমার পরিচয় দেওয়ায় তারা আবার নিশ্চিন্ত মনে জুয়ায় মেতে উঠল। মোটরের আড্ডায় বেশিক্ষণ দাঁড়ালাম না। পথে ইয়াকুবকে বললাম, এদের হাত হতে তোমাকে বাঁচতে হবে। যদি আত্মরক্ষায় অক্ষম হও তবে ভবিষ্যতের আশা-ভরসা চিরজীবনের তরে লোপ পাবে। সে ঘাড় নেড়ে জানালে, তথাকথিত হীনবৃত্তি অবলম্বন করলেও মহান্ আদর্শবাদ দ্বারা সে অনুপ্রাণিত, কলুষ-কালিমা তার চরিত্রকে স্পর্শও করতে পারবে না। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে স্ব-ইচ্ছায় হীনবৃত্তি অবলম্বন করেছে নিজের দেশকে জানাবার জন্য। এমন লোকের সহযাত্রী হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়।

এখানকার হিন্দু যুবকদের একাদশী ক্লাব নামে একটি ক্লাব আছে, কান্দাহার ছাড়বার পূর্বে ক্লাবের মেম্বারগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। আমিও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলাম। আসরে হাজির হবার পর সর্বপ্রথম স্বাগত করা হল কিন্তু সত্বরই আমি বিদায় নেব জেনে সমবেত যুবকগণ দুঃখ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তখনও আমি একাদশী ক্লাবের স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হইনি।

আমার কথা শেষ হবার পর, পেয়ালাভর্তি করে সবাই ভাং খেতে আরম্ভ করল। আমাকেও খেতে দেওয়া হয়েছিল, আমি কিন্তু এই নিকৃষ্ট পানীয় গ্রহণে রাজি ছিলাম না। গাঁজাও সুরু হল। গাজার গন্ধ অসহ্য হয়ে ওঠায় সভা ত্যাগ করলাম। পর্যটককে নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়তে হয়। পর্যটকের স্বাস্থ্য ঠিক না রাখতে পারলে পর্যটন অসম্ভব। দুর্গমপথে চলবার পক্ষে স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। সেজন্যই অভদ্রতা দেখিয়ে আমাকে একাদশী ক্লাব পরিত্যাগ করতে হল।

একাদশী ক্লাবে যেতে হিন্দু যুবকদের কোনরূপ নিষেধ নাই। সবাই জানে একাদশী ক্লাবে কি হয়, অথচ হিন্দু সমাজ এই ক্লাবকে বিনা প্রতিবাদে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। এদের সভা ছেড়ে পথে দাঁড়ালাম এবং কতক্ষণ মুক্ত বাতাস সেবন করে আস্তানায় ফিরলাম। ভোলানাথ আমাকে দেখেই বললেন "আমি ভাল

করেই জানি আপনি বেশিক্ষণ বলতে সক্ষম হবেন না। কি জঘন্ত মনোবৃত্তি এখানকার হিন্দু যুবকদের! যাদের যৌবন শুধু ইন্দ্রিয় সুখভোগে, সেই মেরুদণ্ড-হীন যুবক দ্বারা দেশ বা জাতির কি কোন কার্য হতে পারে?"

ভোলানাথকে ছেড়ে আসতে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু তা হলে কি হবে; আমার কাছে ঘরের মায়ার চেয়ে পথের আকর্ষণই প্রবল; তাই পথেই এসে পড়লাম। সাথী পেলাম ইয়াকুবকে। আমার সাইকেল চালিয়ে ইয়াকুব মোটরের সংগে পাল্লা দিচ্ছিল। ভাবি নি সাইকেল মোটরের সংগে টেক্কা দিয়ে আগে যেতে পারবে। শহর হতে বের হয়ে বড় জোর দু' মাইল পথ ভাল পেয়েছিলাম তারপরই মোটরের চাকা কাদায় ডেবে যাচ্ছিল। দেখলাম এরূপ অবস্থায় যদি মোটরে বসে থাকি তবে হয়তো আবার পায়ে ব্যথা শুরু হবে। সেজন্য ইয়াকুবের কাছ হতে সাইকেল নিয়ে আমি এগিয়ে চললাম। কথা রইল সন্ধ্যার পূর্বে আমার কাছে মোটর না পৌছলে আমিই ফিরে আসব।

সেদিন আমাদের গুস্ক নামক স্থানে পৌছবার কথা ছিল; কিন্তু গুস্ক পৌছান হয় নি, পথেই রাত কাটাতে হয়েছিল। আমাদের সংগে প্রচুর খাদ্য ছিল, পথে কোনও কষ্ট হয় নি। গুস্ক ও কান্দাহারের মধ্যে কোন গ্রাম ছিল না। কাঁকর এবং কাদায় পূর্ণ উন্মুক্ত প্রান্তর। এমন পথে চলা কত আরামের! এর প্রথম কারণ, উন্মুক্ত প্রান্তরে চলা এবং অপরিচিত লোকের সংগে পরিচয় করা একটি আর্ট। এই আর্ট যার জানা নাই সে কখনও পথের সুখ অনুভব করতে পারবে না। আমার চলার সময় সংগে ছিল একটি শিক্ষিত আফগান যুবক; তার সংগে কথা বলে আমার সময় আনন্দের সহিত অতিবাহিত হ'ত। পথে দুদিন কাটিয়ে তৃতীয় দিন সকাল-বেলা আমরা গুস্ক পৌছলাম। সেখানে আমরা একটি ছোট ঘর ভাড়া করে সারাদিন বিশ্রাম করলাম। ড্রাইভার বিশ্রাম করবার ফুরসৎ পেল না। সে মোটর পরিষ্কার করতে লাগল।

গুস্ক ছোট গ্রাম, লোকসংখ্যা হাজারের বেশি নয়। বেলুচিস্থান হতে উটের

পিঠে পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানির ফলে এ স্থানটি একটি বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। গ্রামের মাঝ দিয়ে একটা প্রশস্ত পথ, তারই দুদিকে ছোট ছোট মেটে ঘর। কোনটাতে দোকান আর কোনটাতে ছোট ছোট কারখানা। কারখানা-গুলিতে দুম্বার লোমের কম্বল, দস্তানা, পোস্তিন এসব প্রস্তুত হচ্ছিল। ইয়াকুবের সংগে গ্রামখানা বেড়িয়ে আসলাম। গ্রামে দ্রষ্টব্য বিশেষ কিছুই ছিল না। দেখলাম গ্রামবাসীরা সবাই দারিদ্র এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ইয়াকুব বলছিল এখান হতে একটি পথ বেলুচিস্তান পেরিয়ে সাগরতীর পর্যন্ত গিয়েছে।

গৃস্কের পর হতেই সুরু হল কর্দমাক্ত পথ। পথে মোটর চলতেও পারে না। সেজন্য সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তিরিশ মাইল পথ এগিয়ে গিয়েও এমন একটা স্থান পাইনি যেখানে আশ্রয় নেওয়া যায়। উত্তর দিকে ঢেউ-খেলানো সারি সারি পাহাড়, দক্ষিণ দিকে যতদূর দেখা যায় অনন্ত প্রসারিত প্রান্তর ক্রমনিম্নভাবে সুদূর দিগন্তে মিশেছে। দুদিকের দৃশ্যাবলীই নয়নমুগ্ধকর। কিন্তু ভাবনা হল তিরিশ মাইল পথ অতিক্রম করে মোটরকার আসতে সক্ষম হবে কি না?

যাহোক বিকালের দিকে মোটর এসে পৌছল। আমি তাতে উঠে বসলাম এবং আরও এগিয়ে গিয়ে একটি রুতবায় আশ্রয় নিলাম। পূর্বাকালে বৈদেশিকরা ভারত আক্রমণের সময় পথে ঘরবাড়ী করেছিল। তার এখন অস্তিত্ব নেই, শুধু ইটের স্তূপ পড়ে আছে। কোন কোন রুতবায় লোকজন নেই, কোথাও বা কয়েকজন লোক এক পয়সার জিনিস পাঁচ পয়সায় বিক্রি করবার জন্য বসেছিল। আমাদের কাছে সকল জিনিসই ছিল। তাদের মনোকষ্ট লাঘব করবার জন্য আমি এক ডজন ডিম কিনলাম।

এরূপভাবে চলে আমরা সাবজাওয়ার নামক স্থানের কাছে এসে পৌছলাম। এদিকের পথও মোটর চলাচলের পক্ষে উপযোগী নয়। এখান হতে ইয়াকুবকে নিয়ে কখনো পায়ে হেঁটে কখনো বা সাইকেলে চড়ে সবজাওয়ারের দিকে অগ্রসর হলাম। কতক্ষণ যাবার পর উপর হতে একখানা গাড়ী আসতে দেখলাম।

গাড়িখানা আমাদের কাছেই দাঁড়াল। সামনের সিটে বসেছিলেন একজন ইহুদী। তাঁর মাথায় লাল ফেজ। ফেজের নীচটা একটি পাগড়ি দিয়ে বাঁধা। দাড়ি গোঁফ মোল্লা-কেসনে ছাঁটা। পরনে পাজামা। ভদ্রলোক গাড়ী হতে নেমেই ইংলিশে জিজ্ঞাস করলেন—আপনি ইংলিশ বোঝেন?

—নিশ্চয়ই।

—এই লোকটি কে?

—এটি আমার সাথী, এ দেশের বাসিন্দা।

—আপনার দেশ কোথায়?

—কলিকাতা।

—মাথায় হ্যাট পরেই আসছেন না কি?

—হাঁ, মহাশয়।

—পথে আপনার গলা কেউ কাটতে আসে নি?

—না মহাশয়।

—আপনি মুসলমান?

—না।

—কলিকাতা থেকে হেঁটে এসেছেন?

—না, কতকটা হেঁটে, কতকটা মোটরে, কতকটা সাইকেলে।

ভদ্রলোক ড্রাইভারকে চা বানাতে বলে আমাকে টেনে নিয়ে একটা টিলার উপর বসলেন। তিনি একজন আমেরিকান্ কন্ট্রাকটার, আফগানিস্থানে জলের ডেম্প তৈরী করতে যাচ্ছেন। তাঁকে লণ্ডন, পেরী ইত্যাদি স্থানের লোক বলেছে যে আফগানিস্থান এখনও অসভ্যদের দ্বারা অধ্যুষিত। সেখানে খৃষ্টানদের প্রবেশ নিষেধ। যেতে হলে মুসলমান পোশাকে যেতে হবে।

তাঁকে বললাম "তিনি আফগানিস্থান সম্বন্ধে যা শুনেছেন তা একদম মিথ্যা। এখানে চোর ডাকাত পর্যন্ত নেই। আমার কথা আমেরিকান কন্ট্রাকটারের

বিশ্বাস হল এবং আমারই সামনে দাড়ি সাফ করে ফেললেন। পাজামা খুলে ফেললেন। নেকটাইটি এঁটে বাঁধলেন। আমরা তার সংগে চা-পান করে, পথের ঠিক সমাচার জানিয়ে সবজাওয়ারের দিকে রওনা হলাম। আমরা কিছু দূর যেতে না যেতেই আমাদের মোটরও পৌঁছে গেল।

সবজাওয়ার ছোট একটি বসতবা। তাতে দশ পনর জন লোকের বাস। রাত কাটিয়ে পরের দিন আমরা ক্রমনিম্ন অথচ ভাল পথ ধরে চলতে থাকি। বহু দূর হতে মনে হচ্ছিল হিরাত সহর একটি কমলালেবুর খোষার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। চারি দিকের পাহাড় হতে নির্গত জলরশি বের হয়ে যাবার জন্য একটা পাহাড় যেন ফাঁক হয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে জলরাশি নীচে প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা তখনও হিরাত হতে বহু দূরে ছিলাম ; সেজন্য নির্গত জলরাশিকে একটি আঁকাবাঁকা রজতসূত্র বলেই মনে হচ্ছিল। আমাদের গাড়ির তেলের লাইন বন্ধ করে দেওয়া হল। গাড়ি আপনা হতেই নীচে নামতে আরম্ভ করল। দুঃখের সহিত বলছি পথের দু'পাশে একটিও ফলের বাগান দেখতে পাই নি। জমি উর্বর অথচ বৃক্ষ না থাকার কারণ কিছুই বুঝতে পারি নি। আমাদের লরী ধীরে ধীরে সহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। দু'দিকে মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। আফগানিস্থানে মানুষ এত কম থাকার কারণ বুঝতে বাকি ছিল না। এই দেশটাই হ'ল আক্রান্ত এবং আক্রমণকারীর দেশ অতএব মানুষ স্বাধীন মনে সর্বত্র বসবাস করতে পারছিল না। পথে যে কয়েকটি লোকালয় পেয়েছিলাম প্রত্যেক বসতিতে মিশ্র জাতের লোকই বেশি দেখতে পেয়েছিলাম। এই বিষয়গুলি ও ইয়াকুবকে বলতে ভুলি নি। অবশেষে আমরা তথাকথিত সহরে পৌঁছলাম এবং একটি গারাজে সামান্য সময়ের জন্য বিশ্রাম করলাম।

হিরাত

ইয়াকুব বলছিল "দেখলেন ত আফগানজাতির আর্থিক দুর্গতি কত নীচস্তরের, এই জাতের ভবিষ্যৎ আমাদের উপরই নির্ভর করছে। জানিনা স্টুডেন্ট ফ্রন্ট বলতে কি বুঝা যায় কিন্তু আমি মনে করি আফগানিস্থানের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কলোকের পক্ষে গুরু মহাশয়ের কাছে বসে না থেকে রাস্ট্রনৈতিক দল গঠন করে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সুগম করাই কর্তব্য। আপনি স্বচক্ষে দেখছেন আমি দরিদ্র নই, বেশ আরামে দিন কাটত, কিন্তু সে আরামেব কোন মূল্য আছে কি?"

নিশ্চয়ই নেই ইয়াকুব, তোমাদের দেশ প্রায় ভ্রমণ শেষ করে এনেছি এখন মনের কথা তোমার কাছে বলতে একটুও ইতস্তত করব না, তবে আজ নয়, আরও কয়েক দিন পর, এখনও ইরাণের ভিসা পাই নি, ইরাণের ভিসা না পাওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে থেকো। থাকা তোমার কর্তব্য, থাকতে পারবে কি? ইয়াকুবকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

নিশ্চয়ই থাকব, আপনি কোথায় থাকবেন?

কোথায় থাকি কাল সকালে ঠিক করব। এখানে অনেক ধরমশালা আছে; একটাতে উঠলেই হল। তুমি বোধহয় এখানে নূতন লোক।

আপনার মতই, তবে হিরাত আমাদের এদেশেরই অন্তর্গত; সেজন্য থাকা-খাওয়ার অসুবিধা হবে না।

থাকা-খাওয়ার জন্য তুমি মোটেই না, চলে যাবার পূর্বে অন্তত রুশ-সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছার খরচ দিয়ে যাব।

রুশিয়ায় যাবনা ইয়াকুব বললে।

কেন যাবে না জিজ্ঞাসা করলাম।

সেখানে যাবার কারণ থাকলে ত যাব? যে কারণে লোক রুশিয়ায় যায় সে সব আমি জানি, এখন আমার কাজ হল দেশকে উদ্বুদ্ধ করা। এটাই আসল

কাজ। আপনাকে বিদায় দিয়ে আমি কোনও গ্রামে যাব এবং গ্রামে থেকে গ্রামের লোককে এগিয়ে যাবার পথ দেখাব।

বুঝলাম ইয়াকুব সহজ ছেলে নয়। রাত কাটিয়ে পরের দিন তাকে নিয়েই একজন কোটিপতি হিন্দুর বাড়িতে গেলাম। লোকটা আফগান ব্যাঙ্কের অর্দ্ধেক শেয়ারের মালিক। একজন পাঠান ছেলেকে সংগে দেখে বুঝতে পেরেছিল আমার প্রতি মুসলমানদের সহানুভূতি আছে। একটি কথাও জিজ্ঞাসা না করে একজন বয়কে ডেকে বললে, এই মুসাপীরকে একটি ভাল ঘর দেখিয়ে দাও এবং এখনই খাওয়ার বন্দোবস্ত কর। বয় আমাকে নিয়ে চলার সময় কোটিপতি বললেন, যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারবেন এবং এই বয়ই আপনার খাদ্য এবং আদেশ প্রতিপালন করবে।

বয়ের সঙ্গে ঘরে গেলাম। ঘরটা কুড়িহাত লম্বা এবং সেই অনুপাতে চওড়া। সমস্তটা মেজে মোটা কারপেট দিয়ে মোড়া। এক পাশে একখানা চার পাই, তাতে লেপ, তোষক, সবই ছিল কিন্তু সাজানো ছিল না। আমাদের বসিয়ে রেখেই বয় বিছানা করল এবং কারপেটের উপরে আর একখানা কারপেট বিছিয়ে বসতে বলল। ইয়াকুব দাঁড়াল না, সে আমার সাইকেল এবং পিঠ-ঝোলা আনতে গেল। ইত্যবসরে আমি পাশের কামরায় গরম জলে স্নান করতে সক্ষম হলাম। গরম জলের তদারক করত আর একটি বয়। ইয়াকুব এসেই দেখল স্নান করে আমি পথের ক্লান্তি মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছি। ইয়াকুবকেও স্নান করতে বললাম। সে স্নান করল না। বললে, এতে শরীরে শৈথিল্য আসে এবং অত্যধিক ঘুম হয়। বাস্তবিক পক্ষে স্নানের পরই আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল।

কতক্ষণ পরে বয় নানারকমের খাদ্য সমেত একখানা থালা নিয়ে আসল। ইয়াকুবকে খেতে বললাম। সে মাত্র এক পেয়ালা ইংলিশ চা খেয়েই সন্তুষ্ট হল; বেশী খেল না। খাওয়ার শেষে ইয়াকুবকে নিয়ে পথে বের হলাম। উদ্দেশ্য ইংরাজী

সংবাদপত্র অথবা যা হক কিছু কেনা। অনেক অন্বেষণ কোরে একজন লোকের কাছে কটলেণ্ড হতে প্রকাশিত সংবাদপত্র পেলাম। এই সংবাদ পত্র জিনিষ বাঁধার কাজে ব্যবহার হয়। প্রকৃতপক্ষে হিরাতে সিভিল মিলিটারী গেজেট ছাড়া অন্য কোন সংবাদপত্র পৌছে না। এই সংবাদপত্রের গ্রাহক হিরাতের গভর্ণর। তাঁর বাড়ী হতে সিভিল মিলিটারী গেজেট পাবার বন্দোবস্ত পরে করেছিলাম। ইয়াকুবকে বিদায় দিয়ে সেদিন বিশ্রাম করি।

পথে শুনেছিলাম হিরাতের মেডিকেল অফিসার একজন বাঙ্গালী। বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্য সকালে রওয়ানা হই এবং দশটার পূর্বেই তাঁর দর্শন পাই। এখানে বলে রাখা ভাল বাঙ্গালী বাবু ধর্মে মুসলমান। বঙ্গদেশের সীমানা পেরিয়ে মজফরপুরে তার পিতা বাসস্থান করেছিলেন কিন্তু বাংলাভাষা পরিত্যাগ করেন নি। আমাকে পেয়ে ডাক্তার বাবু বড়ই সুখী হন এবং সেদিনই তার বাড়ীতে নিয়ে যান।

বিকালে তাঁর সঙ্গে হসপিটাল দেখতে যাই। মাত্র এক শত বেডের হসপিটাল। তাতে নানা রকমের রোগী। রোগীর মধ্যে যে সকল চোরের হাত অথবা পা কেটে ফেলা হয়েছে তাদেরও দেখতে পেলাম। সরিয়তের মতে চোরের হাত কেটে ফেলাই ব্যবস্থা ছিল। ডাক্তার আমাকে সে কথা বললেন।

ডাক্তারকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম সরিয়ত দরিদ্র জনগণকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাবার কি ব্যবস্থা করেছে ?

ডাক্তার বললেন 'ভিক্ষা'।

আমি বললাম ভিক্ষা হতে চুরি অথবা ডাকাতি অনেক অংশে ভাল।

সেদিন ডাক্তার বাবু হিরাতের গভর্ণরের সংগে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু যেতে পারি নি। শরীর অসুস্থ ছিল, মনও ভাল ছিল না। ঘরে এসে ডায়রী লিখতে হয়েছিল। যখন ডায়রী লিখছিলাম তখন ইয়াকুব

এসে বললেন তিনি হিরাতে অতিকষ্টে একটি আস্থানা পেয়েছেন এবং এখানেই তিনি সাধারণ ভাবে সাধারণের সংগে মেলামেশার সুযোগ করে নিতে পারবেন। হিরাতের গুরুত্বও কম ছিল না। একদিকে পারস্য অন্যদিকে রুশিয়া। বিপদে আপদে যে কোন দেশে পালিয়ে যাবার সুযোগ ছিল। ইয়াকুব হিরাতের মাহাত্ম্য বলার পর তাঁকে বললাম যদি ভাল মনে করেন তবে এখানেই কর্মক্ষেত্র করে নিন। তিনি হিরাতেই কর্মক্ষেত্র করবেন বলেছিলেন।

হিরাতে পর্যটকদের কতকগুলি নিয়ম মানতে হয়। সে নিয়মগুলি হল যে-কোন ভূ-পর্যটকই হিরাতে আসুন না কেন, তাঁকে গভর্ণরের কাছে যেতে হবে। পর্যটকের অভাব অভিযোগ জেনে গভর্ণর তার প্রতিকার করেন উপরন্তু প্রত্যেক পর্যটককে একশত টাকা করে দক্ষিণাও দেন। আমি হিরাত গভর্ণরের কাছে উপস্থিত হয়ে একখানি ছোট ছুরি এবং এক জোড়া রংগিন চশমার প্রার্থনা জানাই। এ দুটি জিনিসের অভাবে আমি বিশেষ অসুবিধা ভোগ করছিলাম। গভর্ণর আমার প্রার্থনা পূরণ করে বললেন "আফগানিস্থান এখনও ততটা উন্নত হয়নি, আফগানিস্থানে এসে হয়তো আপনার অনেক দুঃখ-কষ্টই হয়েছে, আফগানিস্থানের লোকের পক্ষ হতে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আফগানজাতের যদি কেউ আপনার কোন অনিষ্ট করে থাকে, তবে তাদের ক্ষমা করবেন। পর্যটকদের পীড়ন করে কোন লাভ হয় না। তাদের খুশী করাই ভাল, কারণ তাঁরা অমর নন এটা সত্য। কিন্তু দুনিয়ার যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁরা লিপিবদ্ধ করে যান তা অনন্তকাল মানব-সমাজের বহু কাজেই আসে। আপনার প্রতি যদি আমার দেশের লোক অন্যায় ব্যবহার করে থাকে তবে তা আপনি নিশ্চয় লিখবেন, সে কলংক আমাদের চিরন্তন হয়ে থাকবে। এজন্যই আমি ভূপর্যটকদের বৈদেশিক আক্রমণকারীদের চেয়েও বেশী ভয় করি।" এই বলে হিরাত গভর্ণর একশত টাকার একটি থলি আমার হাতে দিয়ে বিদায় দিলেন।

আফগানিস্থান স্বাধীন দেশ। সে দেশ সম্বন্ধে প্রতিকূল কিছু লিখলে তার প্রতিবাদ করার লোক আছে। সেজন্যই হয়তো আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে কেউ কিছু লিখতে সাহস করে না। কিন্তু ভারতেরই অন্ন খেয়ে ভারতবাসীরই আর্থিক সাহায্য পেয়ে অনেক বিদেশী পর্যটক অবশেষে যখন বই লিখেন তখন ভারতের বিরুদ্ধে নানা অসত্য এবং কাল্পনিক তথ্য প্রচার করতে কুণ্ঠিত হন না। এরূপ একটি লোককে আমি জানি। তার নাম-ধাম বলে লাভ নেই, তবে এই পর্যন্ত বলতে আপত্তি নেই যে তিনি একজন পলাতক রুশ। দাস্যবৃত্তিতে তাঁর অরুচি নেই। যারা রুশদের ইতিহাস পাঠ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, ভলনদীর তীরের অধিবাসীরা ১৯১৭ সনেও ক্রীতদাসই ছিল। মহামতি লেনিন এদের দাসত্ব-শৃঙ্খল মুক্ত করেন। পলাতক রুশেরা দীর্ঘকাল দাস্যবৃত্তিতে অভ্যস্ত ছিল, সেজন্যই স্বাধীনতা তাদের মনঃপূত হয় নি। তারা বিদেশে পালিয়ে এসেছিল। এসব ক্রীতদাসদেরই একটি ভারতের নুন খেয়ে ভারতেরই বিরুদ্ধে অসত্য, অর্ধসত্য ও বিকৃত সত্য উল্লেখ করে এক বই লিখেছিলেন। তাতে দুঃখ করার কিছুই ছিল না। মনে করতে হবে এটা তার দাসত্ব-কলঙ্কিত জঘন্য মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক, প্রকৃত পর্যটকের সত্য-দৃষ্টি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে ছিল না। এই লোকটি ইণ্টার-নেশনেল পাসপোর্ট-এর সাহায্যে পৃথিবীর বেশ খানিকটা বেড়িয়েছিল। পৃথিবী পর্যটন করার সময় আমিও নানারূপ দুঃখকষ্ট ও অসৎ-ব্যবহারে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। কিন্তু সেজন্য কখনও কোন জাতের বিরুদ্ধে বিকৃত তথ্য লিপিবদ্ধ করবার প্রবৃত্তি আমার হয় নি। ভাল করেই জানি কোন জাতিই চিরকাল অবনতির নিম্নতম সোপানে পড়ে থাকবে না।

হিরাত শহর বর্তমান যুগে যেমন মধ্য-এশিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, অতীত যুগেও তেমনি খ্যাতি ছিল। তখন ছিল শৈবদের হিরাত, এখন হয়েছে কূটনৈতিকদের। বাস্তবিক পক্ষে এখানে আর ধর্মের স্থান নেই। মসজিদগুলিতে অতি অল্প লোকই প্রার্থনা করতে যায়—তারা যেন ধর্মকে এড়িয়ে

চলতে চায়। আফগানিস্থানের অন্যান্য অঞ্চলের মত হিরাতে এখনও চোরের হাত কেটে দেওয়া হয়। এতে বোঝা যায় ধর্মকে ছেটে ফেললেও নৈতিক আদর্শ এখনো সেখানকার সমাজে অমর্যাদা লাভ করে নি। যে দেশের লোক ধর্মাচরণ করে না অর্থাৎ লোক শাস্ত্রের ছক-কাটা গোলকধাঁধায় কলুর বলদের মত শুধু অভ্যাসবশেই ঘুরে বেড়ায় না, অনেকের মতে সে দেশ ঘোর অধপতিত, সেখানকার লোকের বাস্তবজ্ঞান নাই। কিন্তু জগতে ধর্মানুসারণকারী জাতিমাত্রেই নৈতিক উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে এমন কথা অতি বড় ধর্মধ্বজীও বলতে পারবেন না। প্রকৃত মনুষ্যত্বের মাপকাঠি যে সব গুণ তার বিকাশ ধর্মম ানা-না-মানার ওপর নির্ভর করে না। স্বাধীন ভাবে যারা চিন্তা করতে শিখেছে তারা ধর্মের খোলস নিয়ে আর সময় নষ্ট করতে রাজি নয়।

এত দিন থাকার পরও হিরাতের বাজার দেখতে যাইনি। একদিন বাজার দেখতে গেলাম। বাজারের গঠন দেখে মনে হল যেন ত্রিপুরা স্টেটের আগরতলায় এসেছি। আগরতলার ব্যবসায়ের স্থানের সংগে হিরাতের বাজারের গঠন অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।

বাজারে গিয়ে দেখলাম সেখানে জাপানী মালে বাজার একবারে ছেয়ে আছে। হিরাতবাসী ব্যবসায়ীরা বেলুচিস্থানের ভেতর দিয়ে নিয়ে এসে সেই মাল সস্তার বিক্রি করছে। একটি দোকানে দেখলাম ভারতীয় সিগারেট বিক্রি হচ্ছে। এক পেকেট সিগারেট কিনে ইয়াকুবকে বললাম, দেখলেন এটাকেই বলে নেশনেলিজম্ বা স্বদেশিয়ানা। ভারতে হয়তো সিগারেটের পেকেটটি মাত্র তৈরী হয়েছে, তবু আমার মন আপনা থেকেই 'ভারতে প্রস্তত' জিনিসটির প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। সেজন্য বলি, স্বদেশে তৈরী জিনিস দেখলেই যে ভাবে গদগদ হতে হবে তার হেতু নেই। আমরা দেখি জিনিসের প্রকৃত নির্মাতা যারা তারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেল কি না। যদি শ্রমিকরা উপযুক্ত মজুরি না পেয়ে থাকে, তবে সে জিনিস স্বদেশের হলেও অস্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্য জিনিস সর্বথা পরিত্যাজ্য।

ইয়াকুব আমার কথায় সায় দিয়ে ঘাড় নাড়লেন।

হিরাতে দেখার মত যদিও কিছুই ছিল না তবুও আমাকে থাকতে হয়েছিল ইরাণের ভিসা তখনও পাই নি। ইরাণ কন্‌সাল ভিসা দেই দিচ্ছি করে সময় কাটাচ্ছিলেন। একদিন ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম ইরাণ কন্‌সাল ভিসা দিচ্ছেন না কেন?

ডাক্তার বললেন ইরাণ স্বাধীন দেশ। ইরাণী কন্‌সাল হয়ত ভাবছেন আপনি একজন বৃটিশ স্পাই সেজন্যই ভিসা দিতে দেরী করছেন। আপনার পক্ষে অনেক কিছু জানতে হবে। যখন ইরাণ যাবেন তখন দেখবেন দক্ষিণ ইরাণে বৃটিশ সরকার কত রকমের জাল ফেলেছে। সেই জাল ফেলার কাজে আপনি যাচ্ছেন কি প্রকৃত পক্ষে ভ্রমণ করতেই যাচ্ছেন সে কথাই ভাবছেন।

ডাক্তারের কাছে এ সম্বন্ধে আর কিছু বললাম না। পরের দিন কন্‌সাল আফিসে যেয়ে অটোগ্রাফ বইখানা কন্‌সালের সামনে ফেলে দিয়ে বললাম "সম্মানিত মহাশয়! দয়া করে আমার ভ্রমণের অটোগ্রাফ বই দেখুন এবং আপনারও নাম সই করে দিন। কন্‌সাল মহাশয় অতি সাবধানে অটোগ্রাফ বইখানা দেখলেন। অটোগ্রাফ বই দেখতে প্রায় দুই ঘণ্টা লেগেছিল। অটোগ্রাফ বই দেখার পর প্রসন্নচিত্তে তিনি আমার পাসপোর্ট ভিসা লিখে দিলেন। ইরাণ যাবার পথ পরিষ্কার হল দেখে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে এসেছিলাম। এবার ইরাণ যাবার পালা। আফগানিস্থানের শেষ গ্রাম ইসলাম কিল্লা। সেই গ্রাম সম্বন্ধে পারস্য ভ্রমণে সবিস্তারে বলা হয়েছে।

— সমাপ্ত —